মার্ক্স



নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম নবপত্র-প্রকাশ ঃ   ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

প্রকাশক ঃ   প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ   আশীষ কোঙার
শ্রীগুরু প্রিন্টার্স
৯এ রায় বাগান স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০০৬

যে-ছোটোরা বড়ো হবে তাদের জন্য

হেসেছেন সেই কবে আমাদের লীলাময় রায়—
বানে ভাসে দেশ, দায়ী কে? না ঐ কম্যুনিস্টি!
তারাই আবার দায়ী, যদি দেশে না হয় বৃষ্টি!
—এখন সবাই নক্‌সাল বলে চারদিকে চায়।
এবারও বলুন আমাদের প্রিয় লীলাময় রায়।।

বিষ্ণু দে

১

চ্যালি, চার্লি, মাস্টার, মোহর, মুর, নিকি, বুড়ো নিক, স্টিম এঞ্জিন।

নাম, সবই ডাকনাম। সবই একজন লোকের ডাকনাম। এই সব নামেই ডাকতেন বাড়ির লোকেরা। বাড়ির লোকেরা বলতে স্ত্রী জেনি আর আদরের তিন মেয়ে। চিঠিও লিখতেন ঐ সব নামে সম্বোধন করে। সে অনেক চিঠি। আদরে স্নেহে প্রেমে দুঃখে যত্নে লেখা অনেক চিঠি। পারিবারিক সমস্যা আর বিশ্বসংসারের নানা সমস্যায় ভরা সব চিঠি।

'স্টিম এঞ্জিন' নামটা বেশ মজার, না? হবেই বা না কেন? ঐ যার কাজের বহর আর পরিধি। তাকে তো কাছের লোকেরা স্টিম এঞ্জিন বলে ডাকতেই পারে। বিপুল পড়াশুনো, অবিশ্বাস্য পরিমাণ লেখাপত্র, রাজনৈতিক সংগঠন আন্দোলন ও বিপ্লবের কাজ। আর সারাজীবনের সঙ্গী দারিদ্র্য। এক প্রকাণ্ড শক্তিমান স্টিম এঞ্জিনই বটে।

নামের একটা মজা স্ত্রীর নাম 'জেনি'-র মধ্যেও ছিল। স্ত্রীর নাম জেনি। আদরের তিন মেয়ের বড়ো জনের নাম জেনি। অন্য দু-জনের নাম লরা ও এলিয়ানোর বা টুসি। জেনির ছোটো মেয়ের নাম জেনি। জেনির এক পুত্র এড়গার, তার সন্তানদের মধ্যে সেজো জনের নাম জেনি। মেজো মেয়ে লরার মেজোটির নাম জেনি। এ প্রায় তকাই-এর মতো। পরিবারে জেনি নামের ছড়াছড়ি।

হতেই পারে ঐ এক নামের মধ্যে সবাই মা জেনিকে স্মরণ করতে চাইছেন। আর তা ছাড়া আমাদের মতো এত নামের বৈচিত্র্য আর কাদেরই বা আছে।

যার নামে এত সব নামের কথা উঠে পড়ল সে মানুষকে কিন্তু শুধু পরিবারের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা যাবে না। চিন্তার সূত্রে ও কাজের ধরণে পরিবার তো বটেই, দেশের সীমা ও নিজের সময়ের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়বে তাঁর নাম। শুধুই কি নাম?

চিন্তার ও কাজের ধরণধারণ ও তার নানা প্রভাবও।

ঐ সব বিচিত্র ডাকনামের মানুষটিকে পৃথিবীর মানুষ চেনে কার্ল মার্ক্স নামে। জন্মসূত্রে দেশ ছিল জার্মানি। কিন্তু সে দেশে তাঁর খুব বেশিদিন থাকা হয়নি। রাজনৈতিক কারণে দেশছাড়া।

জার্মানি থেকে পারী, পারী থেকে বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্। আবার পারী, সেখান থেকে জার্মানির কোলন নগরী। আবার বিতাড়িত। পালাতে পালাতে কিছুটা থিতু হয়ে বসা গেল ইংল্যাণ্ডে এসে। ১৮৪৯। বয়স তখন একত্রিশ। তখন কে জানত যে পঁয়ষট্টি বছরের বাকি জীবনটা কাটিবে এই ইংল্যাণ্ডেই। পরবর্তী চৌত্রিশ বছরের এই জীবনও কিন্তু শান্ত নিশ্চিন্ত ছিল না, নিরুপদ্রব তো নয়ই। সে রকম জীবন তো সবার নয়।

২

১৮১৮ সালের ৫ মে।

আমাদের এখানে বিদ্যাসাগরের জন্ম হবে আরো দু-বছর পরে। এদেশে তখনও কোম্পানির শাসন চলছে। ইংরেজি শিক্ষার পত্তন হচ্ছে। হিন্দু কলেজ গড়ে উঠছে। রামমোহন একটা একটা করে তাঁর বেদান্তের বইগুলো লিখে চলেছেন। একটা যেন নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

জার্মানির ট্রিয়ের শহরে জন্ম হলো কার্ল মার্ক্সের। জার্মানির অতি প্রাচীন এই শহরে সময় যেন বাঁধা পড়েছিল। রাইন নদীর মোজেল উপত্যকায় অবস্থিত। ছোট্ট এক শহর। তখন এর বাসিন্দার সংখ্যা মাত্র হাজার পনেরো। চারপাশে আঙুরের ক্ষেত আর ভূমধ্যসাগরীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ।

শান্ত নিস্তরঙ্গ গ্রামের মতো এক প্রাদেশিক শহরে জন্ম হলো এই শিশুর। এর ক্রিয়াকলাপ কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে দূর-দূরান্তে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে তার নামে, তার বইপত্তরের নামে, তার ভাবনাচিন্তায় উদ্‌বেল হবে কত যে আন্দোলন। আর সেসব আন্দোলনের ওপরে নানাভাবে নানা সময়ে নেমে আসবে কত যে অত্যাচার।

শুধু ইওরোপেই নয়। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে এশিয়ায়, আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায়, দেশে দেশে। ইওরোপের পিছিয়ে-থাকা অঞ্চল রাশিয়াতে এর তত্ত্বের নামে এক বড়ো বিপ্লব হয়ে যাবে ১৯১৭-তে। বিশ শতকের পৃথিবীর ইতিহাস নতুন বাঁক নেবে এই বিপ্লব থেকে।

যেমনটা আর একবার হয়েছিল আঠারো শতকের শেষ দিকে। ফ্রান্সে। ১৭৮৯-তে। ফরাসি বিপ্লব থেকে মানুষ এক রকম নতুন করে স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর কথা শুনল।

এইসব সমাজবিপ্লব সফল কি ব্যর্থ এইভাবে প্রশ্ন তুলে কোনো লাভ নেই। এত বড়ো মাপের এক একটা ঘটনা। তুমুল এক একটা

রাষ্ট্রবিপ্লব। এর মধ্যে অনেক রকমের জিনিস মিলে মিশে থাকে। ভুল-ভ্রান্তি, বাড়াবাড়ি, অন্যায়-অবিচার ও মিথ্যা সবই থাকা সম্ভব। কিন্তু তাই বলে গোটাটা কি ফেলা যায়?

কতগুলো কথা যে চিন্তা করা হয়েছিল, কতগুলো কথা যে বলতে পারা গিয়েছিল এটাও খুব জরুরি। সমাজের স্তরে স্তরে সাজানো ডাহা অন্যায় যে মেনে নেওয়া যায় না, এই সামান্য কথাটা তো বলতে হবে। এই বলা ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই কোনো সোজা কাজ নয়। অন্যায়টা যে অন্যায়, আগে তো সেটা বুঝতে হবে। কেন অন্যায় সে সম্বন্ধেও চিন্তা পরিষ্কার রাখতে হয়।

অনেক কাল ধরে সমাজে বাসা বাঁধে যেসব প্রথা সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা খুব শক্ত কাজ। দীর্ঘদিন ধরে চলছে বলেই মনে হয় সব ঠিক আছে। অন্যায়টা চোখেই পড়ে না। তাই প্রশ্ন তুলতে গেলে খুঁটিয়ে বিচার করতে হয়। ন্যায়-অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। এ কাজ যেমন শক্ত তেমন জরুরি। আর এসব প্রশ্ন যারা তোলে সমাজের কর্তাদের চোখে তারা বড়ো সাংঘাতিক লোক। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জীবনে বড়ো দুঃখ থাকে।

দেশের যা-কিছু ধনদৌলত তা শুধুই সম্রাটের নয়, শুধু রাজা-রানীর নয়। এসব তৈরি করে কারা? যারা মাঠে চাষ করে, যারা কল-কারখানায় খাটে, যারা খনিতে নেমে লোহা কয়লা তোলে, ধনদৌলত তো তাদের হাতেই তৈরি হচ্ছে। প্রকৃতির দানকে তো তারাই কাজে লাগাচ্ছে। মানুষের শ্রম আর প্রাকৃতিক সামগ্রী। এই দুইয়ে মিলে তো গড়ে উঠছে আমাদের পার্থিব সম্পদ। যারা খাটছে তাদের সবারই তো অধিকার আছে এই সম্পদে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে তারাই পাচ্ছে শুধু খুদকুঁড়ো?

রাজা-বাদশার ঘরে বিলাসিতা আর অপব্যয়। আর যা নিয়ে বিলাসিতা, যা নিয়ে অপব্যয় তা গড়ে তুলল যারা, তাদের ঘরে নিত্য অভাব। এ ব্যবস্থা সাধারণ বুদ্ধি মেনে নেবে কেন? অন্তত বেশিদিন মানবে কেন? একদিন না একদিন প্রশ্ন তো উঠবেই।

৩

প্রাদেশিক এক ছোটো শহর ট্রিয়ের। আমাদের জন্মভূমি ও বাসভূমির কত কিছুই যে আমাদের মধ্যে থেকে যায়। আর কত রকম ভাবেই যে থাকে।

তার ইতিহাস ভূগোল, তার জলবায়ু ফুলফল গাছপালা নদীনালা পশুপাখি। সবকিছুই নানাভাবে আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধে। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজভাবে আমাদের সব কিছুতে জড়িয়ে থাকে। যেমন এই রাইনলাণ্ড অঞ্চলের উচ্চারণের টানটোন। সারা জীবন তা মার্ক্সের কথাবার্তায় লেগে ছিল।

এই ট্রিয়ের শহর এক সময়ে ছিল শক্তিশালী রোমক সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপান্বিত সৈন্যবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। গোটা শহরের শরীরে মাখানো ছিল যেন এক রাজকীয় ছাঁদ। কিন্তু পুরোনো দিনের অর্থবিত্ত, জাঁকজমক, রাজা-রাজড়ার মানমর্যাদা ও মহিমা তো আর ধরে রাখা যায়নি। ফলে কিঞ্চিৎ নরম আলো-মাখা এক গরিমা ছিল যেন এই শহরের বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগে ছিল খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের পীঠস্থান। এখানেই নাকি ছিল সবচেয়ে বেশি গির্জার সমাবেশ। ছেলেবেলায় মার্ক্স তো বড়ো হয়ে উঠছিলেন এমনি ধরণের পরিবেশে। একটা শহরের ঘরবাড়ি পথঘাট দরজাজানলার মধ্যেই তো ইতিহাসের ছোঁয়া থাকে। দেশের ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস, শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন, ক্ষমতার ওঠাপড়া। খুব ছোটো বয়স থেকেই মার্ক্সের বোধের মধ্যে অজান্তে এসব সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল।

ট্রিয়ের কিন্তু মার্ক্সকে আরো কিছু দিয়েছিল। এই শহরের ভৌগোলিক অবস্থান ফ্রান্সের খুব কাছে। তাই ফ্রান্সের রাজনীতির ছোঁয়াচ খুব সহজেই লাগে এখানকার জীবনে। ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ এখানেও লেগেছিল। স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ ট্রিয়েরেও এসে পৌঁছেছিল।

বলা হয় যে এই ফরাসি বিপ্লবে ইওরোপে এক পুরোনো জমানার শেষ, আর এক নতুন জমানার শুরু। কোনো কিছুর শেষ বা শুরু অত পরিষ্কার ঠিক থাকে না সব সময়। তবুও বদল বুঝতে গেলে একটা ভাগ তো করতে হয়।

সেই যে মারী আঁতোয়ানেত নাকি বলেছিলেন, 'ওরা রুটি পাচ্ছে না, তা কেক খেলেই তো পারে।' পুরোনো জমানার এই ধরণটা আর বোধ হয় ফেরবার নয়। এখন নতুন গলার স্বর শোনা যাবে। সমাজে নতুন অধিকারের কথা শোনা যাবে। ভূস্বামীদের জায়গায় নতুন শিল্পপতিরা ক্রমে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বদল আসবে। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বের কথা উঠবে।

বছর দশেক যেতে না যেতে অবশ্য উলটো স্রোতের টান লাগবে। নাপোলিয়ঁর উত্থান। ১৭৯৯। ১৭৯৯-এর ৯ নভেম্বর এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন নাপোলিয়ঁ।

এই অভ্যুত্থানই সুবিখ্যাত অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার নামে পরিচিত। ব্রুমেয়ার হল ফরাসি প্রজাতন্ত্রের ক্যালেণ্ডার অনুসারে দ্বিতীয় মাস, অক্টোবর থেকে নভেম্বর। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পরে ১৮৫১-য় ফ্রান্সে আবার এমনি এক অভ্যুত্থান হয়েছিল। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লুই বোনাপার্ত। ইনি ছিলেন প্রথম নাপোলিয়ঁর ভাইপো। সেই প্রতিবিপ্লবের বিশ্লেষণ করে লেখা মার্ক্সের পুস্তিকার নাম *লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার*। সমাজে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে বুঝতে গেলে এ বই আজও আমাদের কাজে লাগে।

প্রথম নাপোলিয়ঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ইওরোপে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের অনেক কিছুই তিনি কার্যত নস্যাৎ করেন। তাঁর নেতৃত্বে এক একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮০৪-এ তিনি সরাসরি নিজেকে ফরাসি জনগণের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। এখান থেকেই সম্রাটের সাম্রাজ্য বিস্তারের শুরু।

৪

ট্রিয়ের মার্ক্সকে অনেক কিছু দিয়েছিল।

রাইনলাণ্ডের বাকি অংশের সঙ্গে একদিন ট্রিয়েরও ফরাসি অধিকারে এল। একদিকে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ও সাম্যের নতুন আদর্শ। আর অন্যদিকে নাপোলিয়ঁর ক্ষমতালাভ। এসব আদর্শের উলটোমুখে হাঁটা। এই টানাপোড়েনের মধ্যেও ফরাসি অধিকৃত ট্রিয়েরও কিছুটা গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার স্বাদ পেল।

১৮১৪-তে রাইনলাণ্ড জার্মান রাজ্য প্রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো। সাধারণ মানুষ এটা খুব ভালো চোখে দেখেনি। ঐ সময়ে জার্মানি বলে কোনো একটা দেশ ছিল না। ছিল জার্মানভাষী মানুষের নানা রাজ্য। সংখ্যা প্রায় শ তিনেক। তার মধ্যে প্রুশিয়া ছিল খুব বড়ো আর প্রতিপত্তিশালী। শাসনব্যবস্থা বড়ো কট্টর। এই প্রুশিয়ার হাতে মার্ক্সকে পরে অনেক নির্যাতন সইতে হবে।

তাঁর জন্মস্থান জন্মের মাত্র চার বছর আগে প্রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রব্যবস্থার একটু খোলামেলা চেহারা, আর তার বজ্রআঁটুনি। এ তফাত কি ছেলেবেলা থেকেই মার্ক্সের মনে গেঁথে যাচ্ছিল? এসব নিয়ে পরে তো তাঁকে অনেক ভাবতে হবে। দেশ কাল সমাজ মানুষ রাষ্ট্র ও প্রকৃতি নানাভাবেই আমাদের মধ্যে থেকে যায়। ইতিহাস এমনি করে তার ছায়া ফেলে। এই সব কথাকেই মার্ক্স তাঁর পরিণত জীবনের দার্শনিক ভাষা দেবেন।

ট্রিয়ের আর কিছু দেয়নি মার্ক্সকে? দিয়েছিল। বিচ্ছিন্নতার বোধ। কোথায় যেন একটা আলগা হয়ে থাকার বোধ। মিলিয়ে না যাওয়া জোড়ের দাগ।

এটা ছিল খানিকটা পারিবারিক। ধর্মীয়-সামাজিক কারণ ছিল তার। মার্ক্স-পরিবার ছিল ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত। ‘মার্ক্স’, এই যে-নামে

আমরা এখন অভ্যস্ত, এটা এক সময়ে ছিল মরদেচাই। তার সংক্ষিপ্ত রূপ মারকুস। মার্ক্সের বাবার নাম ছিল হাইনরিশ মার্ক্স। কার্ল মার্ক্সের পুরো নাম কার্ল হাইনরিশ মার্ক্স। হাইনরিশ মার্ক্সের বাবা, অর্থাৎ কার্ল-এর ঠাকুরদা ছিলেন ট্রিয়ের-এর রাবি, ইহুদি পুরোহিত। কার্ল-এর জ্যাঠামশাইও তাই। ষোড়শ শতক থেকে ট্রিয়ের-এর প্রায় সব রাবিই ছিলেন কার্ল-এর পূর্বপুরুষ।

কার্লের মায়ের পরিবারেও সবাই ছিলেন রাবি। কার্লের মা হেনরিয়েটা ছিলেন ওলন্দাজ। তাঁরা ছিলেন মূলত হাঙ্গেরির বাসিন্দা। ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের দরুন তাঁরা হল্যাণ্ডে চলে এসে বসতি করেন।

ইহুদি নির্যাতন তো ইওরোপের ইতিহাসের বেশ বড়ো ঘটনা। এ ব্যাপারে ছোটোবেলা থেকেই কার্লের চোখ ফুটেছিল। হাইনরিশ মার্ক্স যদিও পুত্র কার্লের জন্মের কিছু আগেই প্রটেস্টান্ট বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত হন, তবে সম্প্রদায়গতভাবে তিনি ইহুদি-বৈষম্যের প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। সৎ ও বিবেকবান পণ্ডিত মানুষ হিসেবে তাঁর খুব সুনাম ছিল। ট্রিয়ের-এ প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ও ছিল নিতান্ত সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন। তার তো এক রকমের বিচ্ছিন্নতার বোধ থাকতেই পারে।

কার্লের মায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল আরো একটু বেশি। একে তো তিনি জার্মান ছিলেন না। তার ওপর অনেক দিন পর্যন্তই তাঁর ইহুদি সত্তা বেশ পরিষ্কার চেনা যেত। তিনি তাঁর ঘরসংসার আর ছেলেমেয়েদের বড়ো করা নিয়ে অনেকটা যেন একলা বোধ করতেন।

হাইনরিশ ও হেনরিয়েটার ন-টি সন্তান। কার্ল সেজো। সবচেয়ে বড়ো দাদা মারা যান কার্ল-এর জন্মের পরের বছরেই। কার্ল-এর বড়ো এক দিদি ছিলেন, আর বাকি ছ ভাই বোনই কার্ল-এর ছোটো। এই ছ জনের মধ্যে দুই ভাই ও দুই বোন বেশ অল্প বয়সেই মারা যায়।

বাকি ছিল দুই বোন।

কার্ল এই বোনেদের ওপর রীতিমতো দৌরাত্ম্য চালাত। ট্রিয়ের-এর রাস্তায় ঐ বোনদের ঘোড়া বানিয়ে চড়া হতো, বেশ জোরে। নোংরা কাদা ময়লা ঘেঁটে আরো নোংরা হাতে কার্ল ঐ বোনদের জন্য কেক বানাত। সেই কেকও তাদের খেতে হতো। ঐ ঘোড়দৌড় ও কেকভোজন সাঙ্গ হলে তবে নানা মজার গল্প শোনাত কার্ল। কার্ল-এর ছোটোবেলার দুষ্টুমির গল্প আরো আছে।

আর একটু বড়ো হয়ে ইস্কুলে যাবার বয়সে কার্ল তো তার বন্ধুদের কাছে রীতিমতো এক আতঙ্ক ছিল। এমনিতে তো পেছনে লাগার নানা বুদ্ধি বার করত, তা ছাড়া তাদের নিয়ে ব্যঙ্গরচনা বানাত আর ছড়া কাটত।

ট্রিয়ের মার্ক্সকে আরো কিছু দিয়েছিল।

মার্ক্স-পরিবারের নিকট প্রতিবেশী ছিলেন হ্বেস্টফালেন পরিবার। লুড়হ্বিগ্ ফন্ হ্বেস্টফালেন ও তাঁর স্ত্রী কারোলিন। কার্ল-এর বাবা হাইনরিশের মতো লুড়হ্বিগেরও ছিল উদারনৈতিক মতাদর্শ। দুই পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা। লুড়হ্বিগ্ কার্লকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি ইংরেজি ছাড়াও জানতেন গ্রিক ও লাতিন। লেখাপড়ায় তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। নিজে ছিলেন সংস্কৃতিমান মানুষ। কার্ল ছেলেবেলায় বাবার কাছে পড়ত ভলতেয়ার ও রাসিন আর লুড়হ্বিগের কাছে হোমার ও শেক্‌স্‌পিয়ার।

বাবা কার্লকে উপদেশ দিতেন এই বন্ধুর উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য। কার্লও বাবার চেয়েও বয়সে বড়ো এই বন্ধুকে খুব বিশেষ চোখে দেখত। বড়ো হবার পরে যখন সে ডক্টরেট ডিগ্রির থিসিস লিখবে গ্রিক দর্শনের ওপর, তখনও এই পুরোনো বন্ধুকে স্মরণ করবে সে। মার্ক্সের থিসিস এই বন্ধুকেই উৎসর্গ করা।

হ্বেস্টফালেন পরিবারের ছিল তিনটি ছেলেমেয়ে। সবার বড়ো জন

জেনি, আর তার ভাই এড্‌গার, ছিল কার্লের খেলার সাথি। কার্ল-এর থেকে চার বছরের বড়ো জেনি। সে ছিল কার্ল-এর দিদি সোফির বন্ধু। কার্লের ছোটোবেলার এই সাথিই পরে কার্ল-এর স্ত্রী, আর তার জীবনের বহু দুঃখ দারিদ্র্যেরও সাথি।

ট্রিয়ের কার্লকে অনেক কিছুই দিয়েছিল।

৫

১৮৩৫-এর অক্টোবর। কার্লের সতেরো বছর বয়স পূর্ণ হল মাত্র কয়েক মাস আগে।

ভোর চারটে। গোটা মার্ক্স-পরিবার জড়ো হয়েছে স্টিমার ঘাটে। কার্লকে বিদায় জানাতে। ট্রিয়ের-এর পাট চুকিয়ে আরো লেখাপড়া করার জন্য কার্ল যাবে অনেক দূরে। পরে অবশ্য কার্ল আরো অনেক দূরে যাবে।

শাখানদী মোজেল ধরে ষোলো ঘণ্টা স্টিমারে গেলে পাওয়া যাবে রাইন নদীর ওপর কোব্‌লেন্‌ৎস। সেখান থেকে পরের দিন আবার স্টিমার ধরে আরো উত্তরে গেলে পাওয়া যাবে বন্‌। বিশ্ববিদ্যালয় শহর এই বন্‌। এখানে এসে কার্ল নাম লেখাবে আইন বিভাগে পড়বার জন্য। ট্রিয়ের-এর ছোটো গণ্ডির জীবন থেকে বেরিয়ে বাইরের পৃথিবীতে এই প্রথম পদক্ষেপ।

নানা ঢেউ, নানা ধাক্কা, নানা ঘটনার ওঠাপড়ায় এবার শুরু নতুন এক জীবনের।

ট্রিয়েরে কার্ল যে-স্কুলে পড়ত সেটা প্রথমে ছিল এক জেসুইট শিক্ষার কেন্দ্র। এখানে তার শিক্ষাদীক্ষা ছিল প্রধানত মানবিক শিক্ষার আদর্শ অনুসারী। ট্রিয়ের-এর বিদ্যালয়ে কার্ল যুক্তিবাদিতা ও রোম্যাণ্টিকতা দুটো ধারারই পরিচয় কিছুটা পেয়েছিল।

যুক্তিবিচার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। এ সবের ওপরে জোর দিয়ে সমাজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো, এটাই যুক্তিবাদী ধারার লক্ষণ। কথায় কথায় শাস্ত্রবচন নয়। বাইবেলে কী আছে শুধুই তাই দেখলে চলবে না। সত্যমিথ্যা ভুলঠিক এসব যুক্তির আলোতে বুঝতে হবে।

আর রোম্যাণ্টিক ধরণ ছিল বেশ আলাদা। যুক্তির কথা অস্বীকার

করা, তা নয়। যুক্তি ছাড়াও যে মানুষের ব্যক্তিত্বে আরো কিছু থাকে সে কথাটা মেনে নেওয়া। আর তাতে 'যুক্তি' কথাটার মানেও হয়তো কিছু বদলে যায়। মানুষের আবেগ স্বপ্ন ও কল্পনা। এ সবই তো আছে। আর এসব নিয়েই তো নানা মানুষ নানা রকমের। তাই সব কিছু এক ছাঁচে ঢালা নয়। সব ঠিক এক রঙের পোঁচে আঁকা চলে না।

ট্রিয়ের-এর উচ্চ বিদ্যালয়ে কার্ল-এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন যোহান হিউগো হ্বাইটেনবাখ। ইনি কার্লকে ইতিহাস পড়াতেন। একজন বিশিষ্ট শিক্ষক। মহাকবি গ্যয়টেও ছিলেন এঁর গুণগ্রাহী। এ ছাড়া ঐ স্কুলের অঙ্কের শিক্ষকের কথাও বলা দরকার। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, এবং দার্শনিক দিক থেকে ছিলেন জড়বাদী। অর্থাৎ, মানুষ সমাজ প্রকৃতি ইহলোক এ সবই ছিল এঁর আগ্রহের বিষয়। ঈশ্বর, জগৎ ও জীবনের মূল লক্ষ্য, পারমার্থিক আদর্শ ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর তেমন গরজ ছিল না। আর ঐ স্কুলে যিনি হিব্রুর শিক্ষক ছিলেন তিনি বিপ্লবের গান বাঁধতেন। এঁদের কাছেই কার্লের প্রাথমিক দীক্ষা।

ট্রিয়ের-এর স্কুলে কার্ল যে সমস্ত বিষয় পড়েছিল তার মধ্যে খুব জোর ছিল ভাষা শিক্ষার ওপরে। কার্ল গ্রিক ও লাতিন বেশ ভালোভাবেই শিখেছিল। অঙ্ক ও ফরাসি ভাষাও বেশ আয়ত্ত করেছিল। খুব পরিশ্রমী ছিল ইতিহাসে।

স্কুলে ঐ যে ভাষা শিক্ষার জোর পেয়েছিল, বোধ হয় সেই জোরেই পরবর্তীকালে সে বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছিল। সেসব ভাষার নথিপত্র পড়ে নিজের গবেষণায় তা ব্যবহার করবার সুযোগ হবে তার।

স্কুলের শিক্ষাও একরকম করে আমাদের মধ্যে থেকেই যায়।

৬

কার্ল এখন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের ছাত্র।

কার্লের বাবাও ছিলেন আইনের লোক। কার্লও আইন চর্চার পথেই শুরু করেছিল। কিন্তু সরাসরি আইনের ডিগ্রি নিয়ে আইনজীবীর জীবিকার পথে যাওয়া ঠিক কার্লের জন্য নয়। তার জীবনের ধারা অন্য খাতে বইবে।

বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্ল ঠিক এক বছর ছিল। এই সময়ে কার্ল-এর সঙ্গে তার বাবার একটু আধটু মনোমালিন্যও শুরু হয়। বন্-এ কার্লের হালচাল তার বাবার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। এই সময়ে কার্ল-এর আঠারো বছর বয়স। এই সেই বয়স, যা বাধা মানা জানে না। এই বয়স কি নিষেধ মানে?

ট্রিয়ের-এর স্কুলের শেষ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কার্ল একটা রচনা লিখেছিল। বিষয় ছিল এক তরুণের ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচন। স্কুলের পরীক্ষার রচনা, হারিয়েই যেতে পারত। কিন্তু এই লেখাটি রক্ষা পেয়ে গেছে। ঐ কিশোর বয়সেই মানবিকতার প্রতি আগ্রহ, সাধারণ মানবিক কল্যাণ, অনেক মানুষের মঙ্গলচিন্তা, এ সব কথাই মার্ক্সের ঐ রচনার মধ্যে ধরা পড়েছিল। শুধুই নিজের জন্য ভালো পেশা, ভালো জীবিকা, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, এই সব নয়।

ঐ রচনার একেবারে শেষের একটা ছোটো অংশ :

> 'আমরা যদি জীবনে এমন কোনো অবস্থা বেছে নিই যাতে প্রধানত মানবজাতির জন্য আমরা কাজ করে যেতে পারি, তাহলে কোনো সমস্যাই আমাদের আর পীড়িত করতে পারবে না, কারণ সেই ত্যাগ স্বীকার তো সবার মঙ্গলের জন্য; তখন আর ছোটো, সংকীর্ণ, স্বার্থপর কোনো আনন্দের অবকাশ থাকে না, আমাদের সুখ তো তখন লক্ষ

লক্ষ মানুষের জন্য, আমাদের কাজ তখন নীরবে বেঁচে থাকবে, নীরবে কিন্তু চিরদিনের জন্য আর আমাদের দেহভস্মের ওপর ঝরে পড়বে মহান সব মানুষের উষ্ণ চোখের জল।'

বন্-এ এসে প্রথম ধাক্কায় কার্ল অনেক বন্ধুবান্ধবের স্রোতে একটু গা ভাসাল। অনেক তরুণ ছাত্র বন্ধু জুটে গেল কার্লের। তারা হৈ হুল্লোড় ফুর্তি তো করতই। নানা রকম বিষয়ে আলাপ আলোচনাও চলত। আর কার্ল তো ছেলেবেলা থেকেই একটু দুরন্ত প্রকৃতির। ওখানেও বন্ধুদের মধ্যে নানা কারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধও হতো। বন-এ কার্লের জীবনের এই ধরণটা বাবার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না।

কিন্তু এ সময়েও কার্ল শুধু ফুর্তি করে সময় কাটায়নি। তাকে এক জবরদস্ত নেশায় পেয়েছিল। কবিতা। বন্ থেকে শুরু, পরে বার্লিনেও চলবে বেশ কিছুদিন। কবিতায় যেন একেবারে মেতে উঠেছিল কার্ল। শুধু কবিতাই বা কেন। ব্যঙ্গ উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি নানা রচনায় তার এই সময়টা একেবারে ভরে উঠেছিল।

একদিকে ট্রিয়ের-এ মা বাবা ভাইবোনদের পরিবার। অন্যদিকে বন্-এর নতুন জীবন। টানাপোড়েন তো স্বাভাবিক। কার্লকে লেখা বাবার অনেক চিঠি থেকে এর কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কার্ল বাড়িতে চিঠি দিচ্ছে না নিয়মিত। মা উদ্‌বিগ্ন, এমনিতেও তাঁর শরীর তেমন ভালো না। বাবা এটা খুব ভালোভাবে নিচ্ছেন না। কার্ল বন্-এর জীবনে টাকাপয়সাও খরচ করছে একটু বেশি বেশি। বাবা সেটাও খুব ভালো চোখে দেখছেন না। ছেলেকে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন, আবার একটু হিসেব করে চলতেও বলছেন। ছেলের ক্ষমতা প্রতিভা অধ্যবসায় বিষয়ে বাবা কিন্তু খুবই ভরসা রাখছেন। ছেলেকে অকপটে লিখছেনও সে কথা।

এই সময়কার কার্লের কবিতার প্রধান প্রেরণা ও প্রসঙ্গ জেনি। ট্রিয়ের-এর খেলার সাথি সেই জেনি। বাল্যসম্বন্ধের চেহারায় বদল হচ্ছে। বাবাও সে ব্যাপারে সচেতন। সস্নেহে পুত্রের ভবিষ্যৎ দায়িত্বের কথা ইঙ্গিতও করছেন।

পুত্রের দিক থেকে জেনির প্রতি কোনো অবিচারের আশঙ্কা কি ছিল বাবার মনে? পরবর্তী জীবনে অবিচার যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কার্ল মার্ক্সের স্ত্রী হিসেবে জেনি সারা জীবনে কখনো সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেন নি। স্বামীর সামাজিক কর্মে ও বিপ্লবে পাশে থেকেছেন প্রায় নীরবে। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি অবিচার তো ছিল। জীবন তো এমনিই।

এই সেই জেনি। যার প্রতি ভালোবাসায় কার্ল তার আঠারো বছর বয়সে একটার পর একটা কবিতা লিখে চলেছে। সেই জেনির নামে 'প্রেমের বই' ও 'গানের বই' নামে কার্লের দু-দুটো কবিতার বই উৎসর্গ করা। এ ছাড়াও কবিতার একটা বই কার্ল তার বাবাকে উৎসর্গ করেছিল, তাঁর জন্মদিনে।

কার্ল-এর কবিতা বিষয়ে বাবা যে খুব উৎসাহী ছিলেন তা অবশ্য নয়। কবিতার জন্য কার্লের সব গোল্লায় যাচ্ছে এতটা তিনি বোধ হয় ভাবেননি। তবে ঐ সব কবিতা তাঁকে তেমন স্পর্শ করেনি কখনো।

নিজের লেখা অল্প বয়সের এসব কবিতা সম্বন্ধে কার্ল মার্ক্স নিজেও পরবর্তী জীবনে যথেষ্ট হাসাহাসি করতেন। কিন্তু যে-বছর ছয়েক কবিতা তাঁর ওপর চেপে বসেছিল, সে সময়ে তা খুব সত্যি ছিল। মনের অন্য ধরণে কবিতার ঐ ঘোরটা পরে কেটে যায়।

বন-এর জীবনে কবিতা ছাড়াও অন্য লেখাপড়ায় যথেষ্ট সময় দিয়েছিল কার্ল। আসলে এই সময় থেকেই অমানুষিক পরিশ্রম করত সে। আর এই পরিশ্রমের অভ্যাসটা সে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল সারা জীবন। হয়তো শরীর খারাপ হবার সূত্রপাত এই অতি পরিশ্রমেই। এই

নিতান্ত তরুণ বয়সেও কিন্তু কার্ল-এর শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারটা ছিল। বাবা তা নিয়ে একটু দুশ্চিন্তাতেও থাকতেন।

জেনি-পর্বের উচ্ছ্বাসময় কবিতার বাইরে দু-একটি নমুনা :

কাজের শর্ত

'গিন্নিমা : তাহলে বলো কী চাই তোমার।
পরিচারিকা : সবাই যা দেয় দেবেন, কিন্তু একটা জিনিস চাই—
ঝুটঝামেলা ভাল্লাগে না
মাসে একবার চায়ের সঙ্গী যেন পাই।'

হেগেল, কান্ট, ফিক্‌টে, শিলার, গ্যয়টে প্রমুখ জার্মান দার্শনিক চিন্তাবিদ ও কবিদের নিয়েও লিখছেন। ছোটো একটা নমুনা :

'শিলারকে নিয়ে নালিশ অনেক আছে
যত্নআত্তির, বাপরে বাপ, শেষ জানে না সে
খাসা একখান মগজ পেয়ে গিয়ে
দিনের চাকায় বাঁধা থাকে না যে।
বাজবিদ্যুৎ খেলার সাথি তার
শাদামাটা কোনো কিছুর মোটেই ধারে না ধার।'

৭

এবার মোহানা।

১৮৩৬-এর ২২ আগস্ট তারিখে বন্-এর রেক্টরের সই করা এক অভিজ্ঞানপত্র নিয়ে কার্ল মার্ক্স বার্লিন যাত্রা করেন।

বার্লিন। সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্র। এ যেন একেবারে সমুদ্রের মুখে এসে পড়া। কত আলাপ-আলোচনা, কত জল্পনা-কল্পনা, কত বুদ্ধিমান স্বপ্নময় যুবকের সঙ্গে মেলামেশা। তাঁর চিন্তায় কল্পনায় জীবনে নতুন ধরণের রং লাগছে এখন।

হেগেল। এই এক নামের সঙ্গে এখন থেকে জড়িয়ে যাবে কার্ল-এর ভাবনার জগৎ। মাত্রই কয়েক বছর আগে, ১৮৩১-এ, মৃত্যু হয়েছে হেগেলের। জার্মানির সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এই হেগেল। পুরো নাম গেয়র্গ ভিলহেল্ম্ ফ্রিড়রিশ হেগেল। ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)-এর পরে হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)-এর চিন্তাধারার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের প্রধান চরিত্র। কিছুদিনের মধ্যেই কার্ল মার্ক্সকে এই ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের সঙ্গে বড়ো রকমের তাত্ত্বিক লড়াইয়ে নামতে হবে। প্রতিপক্ষ যেখানে কান্ট-হেগেল, সেখানে প্রস্তুতি তো মজবুত করেই করতে হবে। বার্লিনের ছাত্রাবস্থা কার্লের সেই প্রস্তুতিপর্ব।

এখানেও তিনি আইন অধ্যয়ন করতেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই বুঝলেন যে আইনের অধ্যয়নের জন্যই তাঁকে দর্শনের আরো ভেতরে যেতে হবে। 'দর্শন' শব্দের মধ্যেই দেখার কথাটা আছে। দর্শন আমাদের তো দেখতেই শেখায়।

বার্লিনে অধ্যাপক হিসেবে পাওয়া গেল এডুয়ার্ড গান্স্-কে। হেগেলপন্থী এক তরুণ অধ্যাপক। পড়াতেন আইনের দর্শন। বয়সে মার্ক্সের থেকে ঠিক কুড়ি বছরের বড়ো। মারাও গেছেন মাত্র একচল্লিশ

বছর বয়সে। চিন্তার ধরণটা ছিল বেশ উদারপন্থী। ফরাসি বিপ্লবী আদর্শে বেশ কিছুটা আস্থাবান। ১৮৩০-এর ফরাসি বিপ্লবেও তিনি ছিলেন সমর্থক। হেগেলের যুক্তিবাদিতার দিকে ছিল তাঁর অগাধ টান। কার্লও ক্রমশ এদিকে ঝুঁকতে থাকলেন।

ইতিহাসের বিকাশ ঘটছে এক বুদ্ধিগ্রাহ্য চালিকাশক্তির দৌলতে। সমাজের যে আইন-কাঠামো তাও গড়ে উঠছে আইন-প্রণেতাদের তত্ত্বমহল থেকে। এই মহলের খোঁজখবর তাই জরুরি। এই ধরণটাই তখন প্রগতিপন্থী বলে চিহ্নিত। মার্ক্স ক্রমশ এই প্রগতিপন্থী হেগেলীয়দের কাছাকাছি এলেন।

এর বিপরীতে কিন্তু অন্য একটা চিন্তাও বেশ জোরালো ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে তাদের দস্তুরমতো প্রতিপত্তি ছিল। নামের সুবিধার জন্য তাদের বলতে পারি প্রথাবাদী। আইন তৈরি হবে দেশের পুরোনো নিয়মকানুন প্রথা ইত্যাদির ভিত্তিতে। সময়ের বদল হয়। তার জন্য হয়তো এখানে ওখানে কিছু মেরামত করে নিতে হতে পারে। হেগেলীয়দের চিন্তায় এঁরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী। এঁদের ঝোঁক তো একটু প্রাচীনের দিকে।

আইন দর্শনের এই দুই ঘরানার মধ্যে তর্কবিতর্কও বেশ ছিল। তবে প্রুশিয়ার তখনকার অবস্থায় খোলামেলা রাজনীতির বিতর্ক সম্ভব ছিল না। এই সব তত্ত্ব আলোচনার মধ্যেই সমসাময়িক রাজনীতির ছায়া পড়ত।

আইনের দর্শন নিয়ে চিন্তায় মার্ক্স এমন মেতে উঠলেন যে দেখতে দেখতে তিনশো পৃষ্ঠার এক পাণ্ডুলিপি লিখে ফেললেন। এই পর্বে হেগেল কান্ট ও ফিকটের সঙ্গে তাঁকে রীতিমতো লড়াই করতে হচ্ছে। মানুষের কর্মকাণ্ডে পৌঁছবার আগে তার ধারণার জগতে আমাদের মন দিতে হবে। ধ্রুপদী দর্শনের এই ধরণটা মার্ক্সের হাতে অনেক বদলে যাবে পরে। মানুষের চেতনার কথা বাদ যাবে তা মোটেই নয়। কিন্তু

মানুষের প্রকৃত চলাফেরা ও জীবনযাপনের যে-জগৎ, দর্শনের মধ্যে তার যোগ্য স্বীকৃতি চাই। ধারণাকে প্রকৃত জগতে টেনে নামানো হবে এখন থেকে মার্ক্সের দার্শনিক দায়।

কবিতার টান একটু একটু করে কমে আসছে। কিন্তু কাণ্ট ফিক্‌টেকে ছেড়ে যাবার কথাটা এক টুকরো কবিতাতেই বলা রইল :

'কাণ্ট ও ফিক্‌টে দিল উড়াল
স্বর্গ আকাশ পার
দূরের সে কোন দেশের খোঁজে
নাম জানে না কেউ।
আমি বাপু সত্যি কথা মোদ্দা কথা যেটা
খুঁজে বেড়াই পথে ঘাটে,
পাব বলেই ভাবি।'

৮

শেষরাতে মোমবাতির আলোয় বাবাকে চিঠি লেখা চলছে। লেখাপড়া, ভাবনাচিন্তা, নতুন পরিকল্পনার কথা। জেনির কথা। সবই জানাচ্ছেন বাবাকে।

বার্লিনের ছাত্রবয়সে একটানা এত পরিশ্রম করছেন যে শরীর খারাপ হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই গলা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। ফুসফুস একটু দুর্বল ছিলই। তখনকার দিনের মারাত্মক ব্যামো। যক্ষ্মার লক্ষণ ধরা পড়ল। ডাক্তারের উপদেশ হাওয়া বদল করতে হবে।

বার্লিন থেকে কাছেই স্ট্রালো নামে এক গ্রাম। শরীর অসুস্থ, কিন্তু মন একেবারে তাজা।

যেসব চিন্তাভাবনায় এতদিন অভ্যস্ত, তার অনেক কিছু থেকে সরে আসতে হচ্ছে। ধারণার জগৎ আর প্রকৃত জগৎ এই দুইয়ের টানাপোড়েন নিয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি নিজের পথ কাটছিলেন তখন। হেগেল এখনও তাঁর সহায়। হেগেলের বিপরীতে অনেক দূরে যেতে হবে এর পরে। কিন্তু অনেকটা হেগেলরই হাত ধরে। হেগেল থেকেই পেয়ে যাচ্ছেন অনেক ধারণা। নিজের মতো সাজিয়ে নিচ্ছেন সেসব। ইতিহাসদৃষ্টি, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি, বিচ্ছিন্নতা, রাষ্ট্রিক অধিকার, জনসমাজ। এই সব বিষয়ে ভাবতে হবে এখন।

ভাবছেন। ভাবছেন আর লিখছেন।

হেগেলকে নিয়ে এই সময়ে মার্ক্সের অস্বস্তিরও অন্ত ছিল না। যতই ছাড়াতে চাইছেন, তত জড়িয়ে পড়ছেন। আর তাতেই আরো রাগ বাড়ছে। পাগলের মতো একলা একলা ঘুরছেন রাস্তায় রাস্তায়। এলোপাথাড়ি, নোংরা জলাজঙ্গল। রাস্তার মাস্তানদের সঙ্গে ভাব জমাতে ইচ্ছে হচ্ছে কখনো বা। বাড়িওলার সঙ্গে শিকারে বেরিয়ে পড়ছেন। চলছে এই রকম অস্থিরতা।

অসুস্থ শরীরে স্ট্রালোতে বিশ্রাম। আদ্যোপান্ত হেগেল পড়ে নিলেন। হেগেলচর্চা শুধু পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না।

এক হেগেল-সংঘের সন্ধান পেয়ে গেলেন। অনেক জ্ঞানীগুণী লোক এই সংঘের সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক। বার্লিন পর্বের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আডল্‌ফ্ রুটেনবের্গকেও মার্ক্স এখানে পেয়ে গেলেন।

ফ্রান্‌ৎসোয়জিশে স্ট্রাসের এক কাফেতে নিয়মিত আসর বসত এই সংঘের। হুল্লোড় ও ফুর্তি এখানেও হতো। রীতিমতো দর্শনচর্চাও চলত। তরুণ হেগেলীয় আন্দোলনের এটাই ছিল প্রাণকেন্দ্র।

'ডক্টরদের ক্লাব' নামে প্রসিদ্ধ এই ক্লাবটিকে ঘিরে তখন একদল তরুণ বুদ্ধিজীবী। বোহেমীয় জীবনযাপনের জন্য ও নানা নতুন ধ্যানধারণার জন্য রক্ষণশীলদের চক্ষুশূল। এই সময় মার্ক্সের জীবনযাপনও প্রচণ্ড বোহেমীয়। লম্বা চুল, আধময়লা পোশাক, বিয়ারের গ্লাস হাতে অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরে লেখাপড়া, তত্ত্বচর্চা আর তর্কবিতর্ক. এই তখনকার কার্ল মার্ক্স।

পরিবার থেকেও বেশ বিচ্ছিন্ন। বাবাও রীতিমতো বিরক্ত। ছেলের খরচের বহরও বেশ লম্বা চওড়া।

এখানকার বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন কার্ল কোয়প্পেন, ব্রুনো বাউয়ের ও তাঁর ভাই এডগার। সকলেই মোটামুটি হেগেলচর্চায় মত্ত। আসলে তখনকার বার্লিনের চিন্তাজগতে হেগেলকে বাদ দিয়ে এগোনো সম্ভব ছিল না। পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক হেগেল থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে। এই ছিল সে সময়ের দর্শনচিন্তার দস্তুর। তাই এই সব তরুণেরা হেগেল-মত্ত।

তখনকার মার্ক্সের ধরণধারণ নিয়ে ব্রুনোর ভাই এড়গারের এক কবিতা :

'ছুটফটে ঐ তেড়ে আসছে কে?

ট্রিয়ের-এর এক কালোকোলো, শেকলছেঁড়া আস্ত দানব;
জবর পায়ে আচ্ছামতন মাটির ওপর ঠুকছে পা।
বেজায় রেগে হাত ছুঁড়ছে, আকাশটাকে আনবে পেড়ে
এই বুঝি সে এক্ষুনি এই মাটির পরে।
রাগে গরগর, ক্রমাগত বাগিয়ে ঘুসি জোরসে—
যেন হাজার দানো নাছোড় চেপে ধরছে তার চুলের মুঠি।'

এই এড়গারই কার্লের বর্ণনায় বলেছিলেন, 'চিন্তার অস্ত্রাগার ও ধারণার কারখানা'।

এই কারখানাটি চালাতে গিয়ে অনেক ধারধোর হয়েছিল। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বছরের জীবনে বেশ কয়েকবার ধারের জন্য মার্ক্সের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আর এই পাঁচ বছরে তাঁর ঠিকানা বদল হয়েছিল অন্তত দশ বার।

১৮৩৮-এর মে। কার্লের প্রতি কিছুটা অভিমান নিয়েই বাবা মারা গেলেন। কার্ল-এর দিক থেকে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা অটুট ছিল সারা জীবন। বাবার স্মৃতিতে তাঁর একটা ছবি সব সময় কার্লের সঙ্গে থাকত। আর কত বার কত প্রসঙ্গে যে ঘুরে ফিরে বলতেন বাবার কথা। কার্ল মার্ক্সের মৃত্যুর পরে তাঁর বাবার এই ছবিটা এঙ্গেল্‌স্ শেষ যাত্রায় কফিনের মধ্যে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন।

৯

'তত্ত্বই এখন সবচেয়ে বড়ো বাস্তব কাজ। আর ঠিক এই মুহূর্তে আমরা কেউ জানি না তত্ত্ব সত্যিই কতদূর বাস্তব হয়ে উঠবে।'

ব্রুনো বাউয়ের লিখছেন মার্ক্সকে। এই ব্রুনো বাউয়ের ছিলেন ঐ হেগেল-সংঘের অন্যতম প্রধান সদস্য। তরুণ হেগেলপন্থী হিসেবে মার্ক্স গোড়ার দিকে এঁর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরে অবশ্য তুমুল বিতর্কে নামতে হয়েছিল। *ডী হাইলিগে ফামিলি* (পবিত্র পরিবার) নামে এঙ্গেলস্-এর সঙ্গে যৌথভাবে লেখা বই তো এই বাউয়েরদের সঙ্গে তর্ক। তাত্ত্বিকভাবে মার্ক্স পরে এঁর থেকে অনেক দূরে সরে যাবেন।

কিন্তু এই যে বাউয়ের মার্ক্সকে তত্ত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, এটা তখন খুব জরুরি ছিল। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের কয়েক বছর মার্ক্স আনুষ্ঠানিক ডিগ্রির পড়াশুনো খুব বেশি করেননি। মনটা ততদিনে আইন থেকে সরাসরি দর্শনের দিকে আরো ঝুঁকেছে। কবিতা লেখা থেমে গেছে। জেনিকে এখন কোনো কবিতা পাঠাতে হলে পুরোনো কবিতা কপি করে পাঠাচ্ছেন। বাবার মৃত্যুর পরে পরিবারে আর্থিক টানাটানিও চলছে। একটা কিছু না করলে আর চলে না।

কেজো গোছের কোনো কিছু করা ঠিক সম্ভব ছিল কি? বাউয়ের-এর কথায় মার্ক্স নিজের ভেতরে নিশ্চয় জোর পেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হবার কথা মাথায় এল। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করতে পারলে মন্দ হয় না। ব্রুনো বাউয়েরকে সম্প্রতি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। বাউয়ের-এর সাহচর্যে নতুন দর্শন পত্তনের চিন্তা মার্ক্সকে টানল।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি পেতে গেলে তো ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে হয়। মার্ক্স ডক্টরেট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। পরিহাস এই যে, ডক্টরেট ডিগ্রিটা হবে, কিন্তু অধ্যাপকের চাকরিটা আর হবে না।

ততদিনে এই সব ছেলেছোকরাদের নতুন রকমের কথাবার্তা ও চিন্তাভাবনা রীতিমতো বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। সমাজের চলতি ব্যবস্থার গায়ে বড়ো বেশি জোরে ধাক্কা লাগছে যেন। বই-প্রবন্ধ, বিচার-বিশ্লেষণ, তত্ত্বচিন্তা, এসব এমনিতে দেখতে নিরীহ কাজ। কিন্তু ঠিক অতটা নিরীহ নয়। বেয়াড়া কথাবার্তা যেখানে গিয়ে লাগবার ঠিক লাগে। যাঁরা ভয় পাবার তাঁরা ঠিক ভয় পান।

'তত্ত্বই সবচেয়ে বড়ো বাস্তব কাজ'। তাহলে তত্ত্বে আর বাস্তব কর্মে তো তেমন ফারাক থাকার কথা নয়। এ দুয়ের মধ্যে শক্ত দেয়াল তোলা থাকবে কেন?

মার্ক্সের নিজস্ব দর্শনচিন্তায় এ কথাটা ক্রমশ জরুরি হয়ে উঠবে। আমাদের তত্ত্ব আর আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে কত রকমের চলাচল। এবার সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

গ্রিক ভাষাটা স্কুল থেকেই আয়ত্ত ছিল। গ্রিক দর্শনকেই বেছে নিলেন থিসিস লেখার জন্য। দেমোক্রিতুস ও এপিকুরুস-এর তুলনামূলক আলোচনা। আরিস্ততলের মতো বড়ো প্রতিভার মৃত্যুর পরে গ্রিক দর্শনের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের অবস্থার খানিকটা বোধ হয় মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন মার্ক্স। হেগেলের মৃত্যুর পরে জার্মানিতে দর্শনচর্চায় নামার জন্য এসব ছিল তাঁর প্রস্তুতি।

এপিকুরুস-এর নৈতিক দর্শনের প্রতি মার্ক্সের ঝোঁক বেশ পরিষ্কার। মানুষের আত্মচৈতন্যের ওপর এপিকুরুস খুব জোর দিয়েছিলেন। এই দিকটা মনে হয় মার্ক্সকে টেনেছিল।

মানুষের সবকিছুই আগে থেকে কেউ ঠিক করে দেয়নি। মানুষ নিজের অবস্থা নিজেই তৈরি করে নেয়। প্রকৃতি তাকে যা দেয়, তার ওপর চিন্তা কল্পনা শ্রম ইত্যাদি ব্যবহার করে মানুষ তার জীবনযাপনের ছাঁদ বানিয়ে নেয়। এই সব বানানোর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মানুষের সমাজ ও তার বিশেষ বিশেষ চেহারা। এসব কথার দিকে মার্ক্সকে

তো এখন আস্তে আস্তে এগোতে হবে। হয়তো এপিকুরুস-এর দর্শনে এ ব্যাপারে তাঁর কিছুটা হাতেখড়ি হয়ে থাকবে।

মানুষের মনুষ্যত্ব, তার আত্মচৈতন্য, স্বাধীনতা, পূর্ণ বিকাশ, এই সব ধারণায় মার্ক্স তখন মশগুল। যা কিছু এসবের অন্তরায়, তার সব কিছুকেই সমালোচনায় বিদ্ধ করা, এই তখনকার পদ্ধতি। রীতিমতো মেতে গিয়ে মার্ক্স তো তাঁর থিসিসটা লিখে ফেললেন। ১৮৪১-এর এপ্রিলে সে থিসিস জমা পড়ল। কিন্তু বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়। তুলনায় অনেক ছোটো য়েনা শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই থিসিসই জেনির বাবা লুড্‌হ্বিগ ফন্‌ হ্বেস্টফালেন-এর নামে উৎসর্গ করা। ১৮৪১-এর ১৫ এপ্রিলেই *অনুপস্থিত* ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে গেলেন মার্ক্স।

১০

'কল্পনা করুন রুসো, ভল্‌তেয়ার, হোল্‌বাখ, লেসিং, হাইনে ও হেগেল সবই একসঙ্গে মিলে গেছেন, মিলে গেছেন কিন্তু গাদাগাদি করে দলা পাকানো নয়। এরকম মিলে গেলে যা হয় তারই নাম ডক্টর মার্ক্স।'

মোজেস হেস তাঁর এক বন্ধু অয়েরবাখের কাছে এই ভাষায় পরিচয় দিচ্ছেন কার্ল মার্ক্সের। মোজেস হেস ছিলেন এক জার্মান কমিউনিস্ট, *মানুষের পবিত্র ইতিহাস* গ্রন্থের লেখক। তরুণ হেগেলীয় মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর রীতিমতো হৃদ্যতা ছিল।

মার্ক্স তো ইতিমধ্যে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে গেছেন। বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবার ইচ্ছে ছিল খুব। তা হয়নি। ব্রুনো বাউয়েরও বন্ থেকে বিতাড়িত। জেনির বাবা মারা গেছেন ১৮৪২-এর মার্চে। মার্ক্স ডিগ্রির কাজ শেষ করার পরে যথেষ্ট অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছেন বেশ কিছুদিন।

ট্রিয়ের-এ নিজেদের বাড়িতে থেকে এসেছেন কয়েকদিন। বন্-এ গেছেন, কোলন-এ গেছেন। কোথাও বেশিদিন থাকেননি একটানা। এটা করেছেন, সেটা করেছেন, কোনো কাজ নিয়ে থিতু হয়ে বসেননি কোথাও। নিশ্চিন্ত হয়ে দর্শনচর্চা করা তো সম্ভব হয়নি বটেই। অবশ্য সে বোধ হয় কখনোই হবে না। আর সত্যি কথা বলতে কী, নিশ্চিন্ত হয়ে দর্শনচর্চার কোনো মানে আছে?

দর্শন তো আকাশ থেকে পড়ে না। জীবনের খাঁজে খাঁজে জড়িয়ে থাকে। ক্ষতবিক্ষত হতে হতে দর্শন-ভাবনা এগোয়। সেই ভাবনার স্তরে স্তরে মিশে থাকে রক্তাক্ত কাহিনী। মার্ক্সের ক্ষেত্রে আর কীই বা সম্ভব ছিল। কাজকে তত্ত্বের রূপে দেখা, আর তত্ত্বকে কাজের মধ্যে ফিরে পাওয়া, এই যার পদ্ধতি, তার দর্শনচিন্তা নিশ্চিন্ত হবে কেন?

সংগ্রামেরই অংশ, বাঁচারই একটা ধরণ, এই তো দর্শন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর চাকরি তো পাওয়া গেল না। তাই বলে তত্ত্বের কাজে তো ক্ষান্তি দিলে চলবে না। মার্ক্স সাংবাদিকতার কাজে গেলেন। তরুণ হেগেলীয় বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন আরনল্ড্ রুগে, আডল্ফ্ রুটেনবের্গ, আর ছিলেন মোজেস হেস ও ব্রুনো বাউয়ের। সকলেই মার্ক্সকে টেনে নিচ্ছেন সাংবাদিকতার জগতে।

আরনল্ড্ রুগেকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজ ছেড়ে আসতে হয়েছিল। মতামতের জন্য কর্তাদের সঙ্গে খিটিমিটি লাগছিল। রুগের সম্পাদনায় *ডযেট্শে ইয়ারবুখের* পত্রিকা বলতে গেলে তরুণ হেগেলীয়দের মুখপত্র হয়ে উঠল। ব্রুনো বাউয়ের নিয়মিত লিখছেন। অন্যরাও আছেন। মার্ক্সের সঙ্গে রুগের পরিচয় হলো। প্রুশীয় সেন্সর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখলেন মার্ক্স। পুস্তক সমালোচনা ও অন্যান্য লেখারও প্রস্তাব দিলেন।

এখনকার বন্ধুদের অনেকের সঙ্গেই ক্রমে মার্ক্সের দূরত্ব তৈরি হবে। তবে সবচেয়ে বেদনাদায়ক বোধ হয় ব্রুনো বাউয়ের-এর সঙ্গে বিচ্ছেদ। এ ব্যাপারে বেশ বড়ো রকমের নীতির প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি চলে যাবার পরে, ব্রুনো বার্লিনে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। অধ্যাপনার পদটি যাতে আবার ফিরে পাওয়া যায়। ঐ সময়ের প্রুশিয়া সম্বন্ধে মার্ক্সের সমালোচনা ও বিরক্তি এত তীব্র ছিল যে এ ব্যাপারটা তিনি ভালোভাবে নিতে পারেননি।

এই পর্বে মার্ক্স একটু একটু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। জেনি তা নিয়ে মার্ক্সকে সাবধানও করছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। খানিকটা উদারনীতির দিকে ঝুঁকছে মার্ক্সের মন। প্রুশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজ্ঞতায় এটা খানিকটা স্বাভাবিক। স্বাধীনতার নামগন্ধ ছিল না কোথাও। তাই বেসুর বাজবার লোকের খুব দরকার ছিল।

জেনি হয়তো আগাম বুঝতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ঝুঁকি নিয়ে স্পষ্ট করেই লিখছেন মার্ক্সকে। তবে এটাও নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে আর কীই বা করার ছিল। প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তার এক রাইনলাণ্ডের বুদ্ধিজীবী যুবকের পক্ষে আর কোন পথই বা খোলা ছিল। সব জেনে বুঝেই জেনি নিজেকে জড়িয়েছিলেন মার্ক্সের জীবনের সঙ্গে।

ডক্টরদের ক্লাবের মতো রাইনলাণ্ডের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের ছিল কোলন গোষ্ঠী। সাংবাদিকতার কাজে বন্-এ খানিকটা থিতু হয়ে মার্ক্স এই কোলন গোষ্ঠীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। রাইনলাণ্ড ছিল মোটের উপর উদারপন্থী প্রতিবাদী রাজনীতির উপযুক্ত জায়গা। ঐ যে ফরাসি বিপ্লবের আঁচ লেগেছিল গায়ে, তারই কিছুটা ফল থেকে গিয়েছিল। ইতিহাস এমনি করেই পলিস্তরের মতো জমে ওঠে।

বন্-এ আসবার ঠিক আগেই মার্ক্সের পারিবারিক জীবনে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে। মায়ের সঙ্গে বিবাদ, পরিবারের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ইত্যাদি কাটিয়ে দিদি সোফির বিয়ে হয়ে যাবার পরেই তিনি ট্রিয়ের ছেড়ে বন-এ চলে গেলেন। ট্রিয়ের-এ থাকতে পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ এতদূর বেড়ে উঠেছিল যে বাড়ি ছেড়ে ওখানেই কাছে একটা অতিথিভবনে থাকতে হয়েছিল কিছুদিন।

১১

এত সব ঝামেলার মধ্যেও লেখালেখির কাজ কিন্তু সমানে চলছে। আরনলড রুগের পত্রিকায় তো লিখছিলেনই। এখন *রাইনিশে ৎসাইটুং*-এর মতো পত্রিকার কাছে এসে যাচ্ছেন মার্ক্স।

এই পত্রিকাই তখনকার প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তার মুখ্য বাহন। কোলন গোষ্ঠীর সদস্যরা *রাইনিশে আলগেমাইনে ৎসাইটুং* নাম দিয়ে এক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকা অল্পদিন বাদেই আর্থিক অসুবিধায় পড়ে। তখন অনেক চেষ্টা চরিত্র করে রাইনলাণ্ডের কিছু উদারপন্থী বিত্তবান ব্যক্তিকে দলে জোটানো গেল। এঁদেরই উদ্যোগে ১৮৪২-এর ১ জানুয়ারি থেকে *রাইনিশে ৎসাইটুং* নাম নিয়ে নতুন পত্রিকার প্রকাশ শুরু হলো। এই পত্রিকার উপ-শিরোনাম ছিল 'রাজনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য'।

'আইনের চোখে সবাই সমান', এর সপক্ষে দাঁড়ানো ছিল এই পত্রিকার ঘোষিত লক্ষ্য। রাইনলাণ্ডের বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্তের নাগরিক অধিকার, নাপোলিয়ঁর সিভিল কোড প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, আখেরে জার্মানির ঐক্যসাধন, এসব ছিল এই পত্রিকার রাজনৈতিক অবস্থান।

জার্মানির খণ্ডরাজ্যগুলিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এক সঙ্গে মেলানো কাজটা অবশ্য সহজ ছিল না। কিন্তু এই আদর্শ তখনকার প্রগতিশীল ভাবধারার পক্ষে খুব জরুরি ছিল। এই পথেই হয়তো প্রুশিয়ার মতো শক্তিধর রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী শাসনের খানিকটা মোকাবিলা করা যাবে। এই রকমই ছিল তখনকার ভাবনা। *রাইনিশে ৎসাইটুং* ছিল এইসব আদর্শের মুখপত্র।

বার্লিনের পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মার্ক্সের দূরত্ব তৈরি হলো। উদারপন্থীদের সম্বন্ধে একটা সমস্যা প্রায় সব সময়েই

থাকে। একটু নিচু সুরে বাঁধা থাকে বলে অনেকের ঠিক মন ওঠে না। আবার ঐ সুবাদে আপোষের একটা সম্ভাবনাও থেকে যায়। ফলে উদারপন্থার পাশাপাশি একটা চড়া সুরও প্রায়ই থাকে। খানিকটা প্রতিক্রিয়া থেকেই। তার মধ্যেও একটা প্রতিবাদ থাকে।

বার্লিনের পুরোনো বন্ধুরা অনেকে মিলে *ফ্রাইয়েন* নামে একটা নতুন ক্লাব তৈরি করলেন। জার্মান ভাষায় এই শব্দের অর্থ 'মুক্ত'।

এই মুক্তসংঘের সদস্যেরা প্রায় সবাই ছিলেন তরুণ লেখক। পুরোনো ধরণধারণ ঝেড়ে ফেলে একটু উদ্দামভাবে তাঁরা বেরিয়ে এলেন। মূলত তাঁদের দিন কাটত বিভিন্ন কাফেতে। টাকা পয়সায় টান পড়লে রাস্তায় ভিক্ষা করতেও নাকি তাদের আটকাত না। প্রচলিত মতামত তাঁরা এক ঝটকায় বর্জন করলেন।

বিশেষত ধর্মীয় বিষয়ে এঁদের মতামত ছিল বেশ উগ্র। এঁদের অনেকের মধ্যেই কিছুটা নৈরাজ্যবাদী ঝোঁকও ছিল। কর্তৃত্ব অস্বীকার করার একটা প্রবণতা ছিল। এঁরা ছিলেন অনেকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। মার্ক্স এঁদের দেখানেপনা ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করতেন না।

আমাদের উনিশ শতকের ইয়ং বেঙ্গল দলের কথা মনে পড়তে পারে। এসব ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি তো অনেক সময়ে থাকেই।

এই মুক্তসংঘের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম মাক্স স্টিরনের ও এড্‌গার বাউয়ের। মাক্স স্টিরনের-এর প্রকৃত নাম কাসপার শ্মিট। মার্ক্স এঁর সঙ্গেও পরে বিতর্কে লিপ্ত হবেন।

আর এঁদের কাছাকাছি ছিলেন ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স্। তিনি এখনও মার্ক্সের বন্ধু নন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের বন্ধুতা জমে উঠবে। এবং দুজনেরই জীবনের বিচিত্র ওঠাপড়ার মধ্য দিয়েও সে বন্ধুতা থাকবে অটুট। মার্ক্সের সারা জীবনের কত বড়ো সহায় হয়ে উঠবেন এই এঙ্গেল্‌স্। মার্ক্স-পরিবারের একান্ত সহায়। আর্থিক দুর্দিনে ইনিই পাশে দাঁড়াবেন। একবার নয়, বারবার, প্রায় অভ্যাসের মতো।

১২

৩১ মার্চ, ১৮৪৩। *রাইনিশ্চে ৎসাইটুং* পত্রিকার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

মাত্র ছ-মাস হলো মার্ক্স এই পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিয়েছেন। এই পত্রিকার রাজনৈতিক অবস্থান আগে থেকেই সরকারের চক্ষুশূল। মার্ক্স সম্পাদক হবার পর থেকে পত্রিকা এবং পত্রিকার সম্পাদক দুয়ের ওপরেই খড়্গহস্ত। যাচ্ছেতাই রকমের খবরদারি চলছিল। মার্ক্স বুঝতে পারছিলেন যে এভাবে আর চালানো যাবে না। ১ এপ্রিল থেকে পত্রিকা বন্ধ করে দেবার আদেশ এল। শুধু মার্ক্সের পত্রিকা নয়। আঘাত নেমে এল গোটা সংবাদপত্র জগতের ওপরেই। একের পর এক সব কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

'যাক, সরকার আমার স্বাধীনতা আবার ফিরিয়ে দিয়েছে'। তাঁর এই সময়কার রাগ ও বিরক্তির মধ্যে মার্ক্স চিঠিতে লিখছেন আরনল্ড্ রুগেকে।

এই জোর করে চাপানো স্বাধীনতার পুরো সদ্ব্যবহার করার জন্য মার্ক্স পাড়ি দিলেন পারীতে।

বুঝতেই পারছিলেন যে নিজের দেশের সরকারের যা হালচাল তাতে কোনোরকম ইচ্ছাসুখে কাজ করবার সুযোগ মিলবে না। কিন্তু মার্ক্সের বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে গিয়েছিল একটা অন্য কারণে। একদিকে রাজনৈতিক কারণে পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে পত্রিকার সম্পাদককে প্রুশিয়ার সিভিল সার্ভিসে একটা কাজের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। এ এক রকমের ঘুষ ছাড়া আর কী। বাবার এক বন্ধুর মারফত এই প্রস্তাবটা এসেছিল। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মার্ক্স সিদ্ধান্ত নিলেন, দেশ ছাড়তে হবে।

৩৮ নং রু বান্নো। পারীর শহরতলির এই বাড়িই এখন মার্ক্সের

ঠিকানা। আগামী বছর দেড়েকের জন্য। পারী, আধুনিক ইওরোপের সংস্কৃতির কেন্দ্র। কত ক্ষেত্রের কত প্রতিভাবান মানুষ, কত তাজা মনের মানুষ এই পারীতে থাকেন, আসেন, তাঁদের সৃষ্টিশীল কাজকর্ম করেন।

এই পারীতে এবার সেই বন্ধুতার সূত্রপাত। ১৮৪৪-এর আগস্টে ফ্রিড়রিশ এঙ্গেল্‌স্ দশ দিন থেকে যাবেন পারীতে, মার্ক্সের সঙ্গে, এই রূ বান্নোর বাড়িতে। এঙ্গেল্‌স্-এর জন্ম বারমেন-এ। মার্ক্সের থেকে বছর দুয়েক বয়সে ছোটো। তিনিও এককালে ছিলেন তরুণ হেগেলপন্থী। পরে, মার্ক্সের মতোই, তাঁদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে।

এঙ্গেল্‌স্-এর ছিল পারিবারিক ব্যাবসাপত্র। ফ্রিডরিশকেও সেসব কাজ দেখাশোনা করতে হতো।

পারীর দশটা দিন আলাপে-আলোচনায় তত্ত্ব-পরিকল্পনায় বড়ো আনন্দে কেটেছিল। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ দু-জনেই এই সময়ে পারীর সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলেন। বারমেন-এ ফিরে এই ভ্রমণ বিষয়ে এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্সকে লিখছেন : 'দশ দিন তোমার সঙ্গে কাটানোর যে আনন্দ ও মেজাজ তা আর কিছুতেই ফিরে পাচ্ছি না।' এই দশ দিনেই সেই বন্ধুতার প্রকৃত সূত্রপাত।

লেখাপড়া, চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিতর্কে নামা। এই সব ক্ষেত্রেই একসঙ্গে থাকা। এ এক নজিরবিহীন বন্ধুতা। এত দীর্ঘ দিন, এত রকম পরিবেশে, সুদিনে দুর্দিনে, নানা রাজনৈতিক অস্থিরতায় বন্ধুতা বাঁচিয়ে রাখা কাজটা অত সহজ নয়। আর নিতান্ত ব্যক্তিগত স্তরেও। কার্ল মার্ক্সের জীবনের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য তো কোনোদিনই ঘুচবে না। এঙ্গেল্‌স্ সেখানেও তাঁর ভরসা।

এত সব সত্ত্বেও, দু-জনের এক সঙ্গে লেখা অনেকগুলো জরুরি বই থাকা সত্ত্বেও, এক জনের কথা আর এক জনের ঘাড়ে না চাপানোই

ভালো। সত্যি কথা বলতে কী, এতে তো দুজনের পরেই কিছুটা অবিচার করা হয়। ভালো হোক, মন্দ হোক, এঙ্গেল্‌স্‌-এর রচনা তাঁরই রচনা। মার্ক্সের রচনার সঙ্গে তাকে নির্বিচারে মিশিয়ে না ফেলাই ভালো।

এক অর্থে এঙ্গেল্‌স্‌ যে খানিকটা অবিচারের শিকার এ তো অস্বীকার করার জো নেই। মার্ক্সের সঙ্গে একেবারে ছায়ার মতো মিশে ছিলেন। তাই বলে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দেব না? মার্ক্সের সঙ্গে এঙ্গেল্‌সকে মিলিয়েও দেখতে হবে। আবার দু-জনের চিন্তার বিশেষ বিশেষ ঝোঁক আলাদা করেও চিনে নিতে হবে।

মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌ বন্ধুতার প্রথম ফসল *পবিত্র পরিবার*। ১৮৪৫-' এ প্রকাশিত এই বইয়ের প্রথম গ্রন্থকার হিসেবে এঙ্গেল্‌স্‌-এর নামই ছিল। চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা দু-জনের একসঙ্গে করা, লেখা বেশির ভাগ অংশ মার্ক্সেরই। লেনিন এই বইকে বলেছিলেন 'বৈপ্লবিক বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের উৎস'।

এর পরে ওঁদের যৌথ রচনা *ডী ডয়েট্‌শে ইডিওলগি* (জার্মান ভাবধারা)। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই। এবার প্রথম গ্রন্থকার হিসেবে পাই কার্ল মার্ক্সের নাম। এ বই লেখার সময়ে প্রকাশিত হতেই পারেনি। রচনাকাল ১৮৪৫-৪৬। আর প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩২-এ। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌ তখনকার মতো এই বইয়ের জন্য কোনো প্রকাশকই পাননি। একটি মাত্র পরিচ্ছেদ কেবল ছাপা হয়েছিল ১৮৪৭-এ।

এই বইতেই অনেকটা পরিষ্কার করে বলা হলো ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার কথা। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস, তার সমাজজীবনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস, এসব বিষয়ে ভাবতে গেলে কোন পথে এগোনো যাবে?

হেগেলের দর্শনে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌-এর চিন্তা ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না। নিজেদের পথ নিজেদের মতোই খুঁজে নিতে হবে। *জার্মান ভাবধারা* সেই পথ খোঁজার বই। বইটা ছাপা হলো না বটে, কিন্তু এ বইয়ের

লেখকদের মোটেই মনে হয়নি সব জলে গেল। 'ইঁদুরদের তীক্ষ্ণ সমালোচনার হাতে আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি সঁপে দিয়েছিলাম, বেশ স্বেচ্ছায়। আমাদের যা উদ্দেশ্য, তা তো ইতিমধ্যেই সফল—নিজেদের চিন্তা নিজেদের কাছে পরিষ্কার করা।' এই হলো এ বই বিষয়ে মার্ক্সের কথা।

এই বইয়ে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্-এর প্রধান প্রতিপক্ষ তিনজন। ব্রুনো বাউয়ের ও মাক্স স্টিরনের ছাড়াও ছিলেন লুড়হ্বিগ ফয়েরবাখ। ফয়েরবাখ তখনকার তরুণ হেগেলীয় মহলে খুব প্রসিদ্ধ। এঁর চিন্তার গভীর দার্শনিক সমালোচনা করে ইতিমধ্যেই মার্ক্সকে আরো একখানা পুস্তিকা লিখতে হয়েছে।

ফয়েরবাখ বিষয়ে সূত্রাবলি মার্ক্সীয় দর্শনের এক অত্যন্ত মূল্যবান বই। 'এ পর্যন্ত দার্শনিকরা শুধু দুনিয়াকে বোঝবার চেষ্টাই করেছেন, কিন্তু কাজটা হলো দুনিয়াকে বদল করার।' মার্ক্সীয় দর্শনের একটি প্রসিদ্ধ সূত্র। এই বইয়ের অন্তর্গত। বইটি ছোটো ছোটো সূত্রাকারে লেখা। এই উক্তিটি একাদশ সূত্র। এ সূত্রটি নিয়ে বিস্তর কথা কাটাকাটি আছে। আমাদের তত্ত্ব ও আমাদের কাজ, এ দুয়ের মধ্যেকার এক ধরণের যোগসূত্রের কথা পাই আমরা এখানে।

পৃথিবী যেমন আছে তেমনি থাক, আমাদের কাজ শুধু তাকে বোঝবার চেষ্টা করা। নাকি বুঝতে বুঝতে পৃথিবীকে বদলানোও আমাদের কাজ? আমাদের বোঝাটাও কি ঐ বদলানোর কাজের সঙ্গে জড়ানো? 'কী করতে চাই' তার সঙ্গেও কি 'কী হচ্ছে' সে ব্যাপারটা মিশে যায়? তাহলে 'নিরপেক্ষ দেখা', 'নির্মোহ ব্যাখ্যা' এসব কথার মানে কী? এরকম অনেক প্রশ্ন ঐ একাদশ সূত্রের আলোচনায় উঠে পড়ে।

মার্ক্সীয় চিন্তার বিশেষ ধরণে পৌঁছবার জন্য অনেকেই এই সূত্রকে মনে করেন বড়ো সহায়।

১৩

পারীতে চলে আসবার আগেই জেনির সঙ্গে মার্ক্সের বিয়ে হয়ে গেছে। রাইন নদীর ওপর ক্রয়েজনাখ নামে এক ছোটো শহরে। জেনি ও জেনির মা তখন কিছুদিনের জন্য ছিলেন ওখানে। বিয়ের পর বেশ আনন্দ ও মনের খুশিতে কাটল কয়েক মাস।

লেখাপড়া ও দর্শনচিন্তায় অবশ্য ছেদ পড়েনি। রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে হেগেলীয় চিন্তার সমালোচনা করে এক পাণ্ডুলিপি লিখে ফেলেছেন। অসমাপ্ত। এ তো প্রায় মার্ক্সের স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। বহু লেখাই অসমাপ্ত, জীবৎকালে অপ্রকাশিত। ওঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা, তিন খণ্ডের *ডাস কাপিটাল*। তারও মাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল উনি বেঁচে থাকতে। বাকি দু-খণ্ড মৃত্যুর পরে, এঙ্গেলস্-এর যত্নে ও সম্পাদনায়।

পারী-পর্বে রচিত মার্ক্সের একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় অনেক পরে। ১৮৪৪-এ রচিত অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ক এই পাণ্ডুলিপি সাধারণত *পারী পাণ্ডুলিপি* নামেই পরিচিত। এখন যে প্রকাশিত বইটি পাওয়া যায় তার নাম *১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি*।

পুঁজিবাদী পণ্যপ্রধান সমাজের এক বিচ্ছিন্নতার কথা বলা আছে এই বইতে। মার্ক্সের চিন্তায় পণ্যের ধারণা খুব খেয়াল করার মতো। দ্রব্য আমাদের প্রয়োজন মেটায়। সরাসরি তা আমাদের কোনো না কোনো কাজে লাগে। আর পণ্য আমরা উৎপাদন করি বিক্রি করার জন্য। তার থেকে বিক্রেতার লাভ হয়। দ্রব্য আর পণ্যের এই ফারাক থেকে মার্ক্স অনেক কথা টেনে বার করবেন। মানুষের সমাজজীবন বিষয়ে অনেক নতুন চিন্তার সন্ধান পেয়ে যাব আমরা।

সম্পূর্ণ অজানা এই পাণ্ডুলিপিটি এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে

প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন এই বিচ্ছিন্নতা ও তার তাৎপর্য নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা ও তর্কবিতর্ক জমে উঠেছিল। আমাদের এখানে বইটির ব্যাপক পরিচিতি হয় আরো পরে, পঞ্চাশ-ষাটের দশকে। এখানেও তর্কবিতর্কের জোর ঢেউ উঠেছিল।

৩৮ নং রূ বান্নোকে কেন্দ্র করে আরো অনেক আলোড়ন তৈরি হলো। এঙ্গেল্স্-এর সঙ্গে বন্ধুতার সূত্রপাত তো ছিলই। বিখ্যাত জার্মান কবি হাইনরিশ হাইনে-ও তখন পারীতে। এই পর্বে মার্ক্সের সঙ্গে তাঁরও খুব বন্ধুতা জমে ওঠে। আরো ছিলেন বিপ্লবী কবি গেয়র্গ হেরহ্বেগ। এ ছাড়াও ফরাসি সমাজতান্ত্রিক ভাবুকরা তো আছেনই।

ফরাসি সমাজতান্ত্রিকদের এক প্রধান তাত্ত্বিক প্রুধোঁ। এঁর চিন্তা নিয়েও মার্ক্সকে অনেক লড়াই লড়তে হয়েছে। প্রুধোঁর দর্শনচিন্তার বিখ্যাত বই *দারিদ্র্যের দর্শন*। তার সমালোচনায় লেখা মার্ক্সের বইয়ের নাম *দর্শনের দারিদ্র্য*।

এসব বইপত্র লেখা তো আছেই। সাময়িক পত্রের প্রয়োজনের কথা কিন্তু মার্ক্স কখনো ভোলেননি। *রাইনিশে ৎসাইটুং* বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকেই নতুন প্রকাশনার কথা মাথায় ঘুরছিল। জার্মানি ও ফ্রান্স দু-দেশেই খানিকটা কাছাকাছি ভাবনাচিন্তা করেন যাঁরা তাঁদের মেলানো যায় কিনা এ চিন্তাটা মাথায় ছিল। মার্ক্সের কাজের ধরণে আন্তর্জাতিকতার একটা বড়ো ভূমিকা তো ছিলই। শুধু এক দেশে এক জায়গায় আটকে থাকলে চলবে না। দেশে দেশে ছড়িয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন দেশের ভাবুকদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।

প্রকাশিত হল *ডয়েট্শে-ফ্রান্‌ৎসোয়জিশে ইয়ারবুখের*। প্রথম যুগ্ম সংখ্যা বেরোয় ১৮৪৪-এর ফেব্রুয়ারিতে। জার্মানির ও ফ্রান্সের ভাবুকদের যোগাযোগের সেতু।

১৪

ইয়ারবুখের বেরোল বটে, তবে বেশিদিন চলতে পারবে না। পত্রিকার রাজনৈতিক চরিত্র কর্তাদের চোখ এড়ায়নি। প্রুশীয় কর্তৃপক্ষ গোড়া থেকেই একে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন।

প্রুশিয়ার রাষ্ট্রদূতের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই পত্রিকার জার্মানিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো। মার্ক্স, রুগে ও হাইনে, এঁরা যাঁরা পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন তাঁদের জন্য ফতোয়া জারি করা হলো। এঁরা কেউ প্রুশিয়ার মাটিতে পা দিলেই যেন গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী অন্যান্য পত্রিকার তরফেও *ইয়ারবুখের*-এর ওপর আক্রমণ চলতে থাকল। এসব সত্ত্বেও এই পত্রিকা, তার বক্তব্য, মার্ক্সের রাজনীতি ও দর্শন চিন্তার ধরণ আস্তে আস্তে কিছুটা কিন্তু ছড়াল। বিভিন্ন দেশেই এসব কথাবার্তা একটু আধটু পৌঁছল। জার্মানিতে, রাশিয়াতে। ভিসারিওন বেলিনস্কি, আলেকজান্দার হেরজেন প্রমুখ রুশ চিন্তাবিদদের নজরেও এল মার্ক্সের রচনাবলি। গোপনে গোপনেও কিছু কিছু লেখাপত্র হাতে হাতে ছড়াতে থাকল।

কিন্তু মার্ক্সের পারীর বাসও অল্পদিনেই গোটাতে হবে। এখানেও প্রুশীয় সরকারের রোষদৃষ্টি ওঁকে তাড়া করে ফিরল। *ইয়ারবুখের* অত্যন্ত স্বল্পায়ু।

এর পর মার্ক্সের সঙ্গে আর একটি পত্রিকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। *ফোরওঅর্টস* নামে এই পত্রিকাটি আগে থেকেই ছিল। একটু রক্ষণশীল ধরণের কাগজ। নতুন সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে প্রগতিশীলদের জন্য এই পত্রিকার দরজা খুলে গেল। মার্ক্স হাইনে এঙ্গেল্‌স্ এঁরা সবাই এই পত্রিকার কাছে চলে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কর্তাদেরও নজর পড়ল। নতুন ধরণটা তাঁদের একেবারে পছন্দ নয়। এতো রীতিমতো বিপ্লবী রাজনীতি প্রচার করা

হচ্ছে। তা কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না।

অন্যান্য কিছু পত্রিকাও ভয় পেয়ে গিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল। পারীর একটি পত্রিকা লিখল, 'এ তো প্রথম ফরাসি বিপ্লবের সময়কার যে-কোনো হ্যাণ্ডবিলের চেয়েও খারাপ।' এক জার্মান পত্রিকা সরাসরি প্রশ্ন তুলল : 'ফরাসি সরকার কিংবা জার্মান রাজ্যগুলির সরকার কি এসব হ্যাণ্ডবিল সহ্য করবেন?' এরকম 'বিপজ্জনক' পত্রিকা বন্ধ করতে হবে বলে দাবি উঠল পত্রিকার জগৎ থেকেই। কোথায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি, আর কোথায় 'বিপজ্জনক' পত্রিকা বন্ধের দাবি।

ফরাসি কর্তৃপক্ষ *ফোরওর্টস* পত্রিকার অনেক লেখকের বহিষ্কার-আদেশ ঘোষণা করলেন। প্রুশিয়ার চাপ ছিল। অন্য নানা মহলের বিপদের আশঙ্কা ছিল। মার্ক্স, হাইনে, ব্যুরগেরস, বাকুনিন এঁদের সবার ওপর আদেশ জারি হলো।

পরে হাইনের ব্যাপারে সরকারকে খানিকটা পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। জনমতের চাপ ছিল। কিন্তু মার্ক্সের আদেশ বহাল রইল। ১৮৪৫-এর ৩ ফেব্রুয়ারি মার্ক্স পারী ছাড়লেন।

ছাড়লেন বটে, কিন্তু পারী পর্ব তাঁর জীবনে স্থায়ী দাগ কেটে গেল। ফরাসি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হলো। এখানকার স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতার মেজাজ তাঁর মনে এক নতুন স্বাদ নিয়ে এল। আর এখানকার বন্ধু সমাবেশ। এঙ্গেল্‌স্‌ তো বটেই। এই পর্বের মহা মূল্যবান বন্ধুতার নাম হাইনে।

হাইনেও তাঁর এই তরুণ বন্ধুর সাহচর্য খুব উপভোগ করতেন। নিজের কবিতা নিয়ে মার্ক্সের সঙ্গে নিবিষ্ট হয়ে আলোচনা করতেন। আর মার্ক্সের ঘনিষ্ঠতায় হাইনেরও সমাজদৃষ্টিতে আরো নতুন ছোপ লাগছিল। *তাঁতি* এবং *জার্মানি : এক শীতের গল্প* হাইনের এই পর্বেরই রচনা। *এক শীতের গল্প* মার্ক্সই প্রথম ছেপেছিলেন, *ফোরওর্টস* পত্রিকায়।

হাইনে মার্ক্স ও জেনির নতুন সংসারেও ছিলেন অবাধ ও সহজ। রূ বান্নোর বাড়িতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এক ছোটো ঘটনায় মার্ক্স-পরিবার হাইনের কাছে চিরঋণী। যেমন যাতায়াতের পথে ঢুকে পড়তেন, তেমনি একদিন হাইনে রূ বান্নোর বাড়িতে ঢুকে দেখেন পরিবারের বড়ো বিপদ। বড়ো মেয়ে জেনির তখন মাত্র মাস ছয়েক বয়স। খুব অসুখ। খিঁচুনি হচ্ছে। মা-বাবা হতভম্ব। ধাত্রীও অসহায়। ডাক্তার আসারও সময় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। হাইনে উপস্থিত বুদ্ধিতে বাচ্চাকে জল ছিটিয়ে স্নান করিয়ে দিলেন। মেয়ে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল। মা-বাবাও কিছুটা নিশ্চিন্ত।

পারী থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে এই হাইনেকেই মার্ক্স লিখেছিলেন : 'যাদের ছেড়ে যাচ্ছি এখানে, তার মধ্যে সবচেয়ে শক্ত হচ্ছে, হাইনে, তোমাকে ছেড়ে যেতে। যদি তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতুম।'

সে ব্যবস্থা অবশ্য কর্তারা প্রায় করেই ফেলেছিলেন। নিতান্ত হাইনের বহিষ্কার-আদেশ মকুব হয়ে গেল, তাই।

১৫

ব্রুসেল্‌স্‌, পারী, লণ্ডন। মানচিত্রে এই তিনটে বিন্দুকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করে দেখো। ঠিক যেন এক ত্রিভুজ। আগামী বছর চারেক এই ত্রিভুজের এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে ছুটে বেড়াবেন মার্ক্স।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেল্‌স। হল্যাণ্ডের থেকে আলাদা হয়ে দেশটা স্বাধীন হয়েছে মাত্র বছর পনেরো আগে। দ্রুত শিল্পোন্নয়ন হতে শুরু করেছে। ইওরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রাজনৈতিক আবহাওয়া অনেকটা খোলামেলা। ব্যক্তির স্বাধীনতা এখানে অন্য অনেক দেশের তুলনায় নিরাপদ। আর তাই এখানে প্রচুর শরণার্থীর ভিড়।

মার্ক্স ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বেশ জড়িয়ে পড়েছেন। সরাসরি কমিউনিস্ট রাজনীতি এখনো তেমন করে দানা বাঁধেনি। *লীগ দ্য য়ুস্ত্* নামের গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে পারীতেই। সাম্যের লক্ষ্যে গঠিত এক সমিতি। বস্তুত এক কমিউনিস্ট গোষ্ঠী। গণতন্ত্র ও উদারনীতির সমর্থনে তাঁর লেখায় যে জোর পড়ছে তাতে প্রগতিশীল আন্দোলন ও সংগঠন থেকে বেশি দূরে থাকা আর সম্ভব হবে না।

ব্রুসেল্‌সেই কমিউনিস্ট লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সময়ে মার্ক্সের চিন্তাভাবনা ও রচনাতে নতুন সুর লাগতে শুরু করে। এই নতুন পথে পাড়ি দিতে গিয়ে তাঁকে অনেক দূর এগোতে হবে।

শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ নয়। শুধু উদারনৈতিক সংস্কার নয়। শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা এল ক্রমে। সমাজের শ্রেণী সম্পর্কের বিষয়ে, বিভিন্ন শ্রেণীর গড়ন ও তাদের সামাজিক ভূমিকা বিষয়ে মন আস্তে আস্তে সজাগ হচ্ছে। এই সময়ে সরাসরি সমাজের অর্থনৈতিক

কাঠামো নিয়ে লেখাপড়ায় ও গবেষণায় মেতে উঠবেন তিনি।

পুঁজিপ্রধান সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির সমালোচনা তৈরি করতে হবে। তার জন্য অনেকটাই নতুন ধরণের বোধের প্রয়োজন। সেই যে *পারী পাণ্ডুলিপির* বিচ্ছিন্নতার ধারণা থেকে যাত্রা শুরু। এর পর পণ্য উৎপাদনের নানা দিক নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। বুঝতে হবে সমাজজীবনের কতটা দূর পর্যন্ত বদলে যেতে পারে এই পণ্য উৎপাদনের টানে।

রাজনীতি থেকে সংস্কৃতি থেকে আচার আচরণ চলাফেরা শিক্ষাদীক্ষা সব। পণ্য উৎপাদনের ধরণধারণের সঙ্গে যে কীভাবে জড়িয়ে থাকে এসবও, তা ক্রমে মার্ক্সের ভাবনায় এল। হেগেলের অধিকারের দর্শন বিষয়ে আগেই লিখেছেন। এই সব রচনার মূল ভাবনা এখন আরো খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে। তথ্যের টুকিটাকির সঙ্গে মেলাতে হবে। এমনি ভাবে একটু একটু করে মার্ক্স তাঁর প্রধান গ্রন্থের দিকে এগোচ্ছেন। *ডাস কাপিটাল* নামের সেই বিশাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বেরোবে অবশ্য আরো অনেক পরে, ১৮৬৭-তে।

ব্রুসেল্‌সেও যে মার্ক্স খুব শান্তিতে ছিলেন তা নয়। প্রুশিয়ার স্বৈরতন্ত্রী চাপ তাঁকে পারীতেও তাড়া করে ফিরেছিল। ব্রুসেল্‌সেও একেবারে রেহাই দেয়নি। রাজনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হবেন না এই মর্মে অঙ্গীকার করে তবে ব্রুসেল্‌সে থাকবার অনুমতি মিলেছিল। প্রুশিয়ার পুলিশের চাপ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। একটা সময়ে মার্ক্স আমেরিকায় চলে যাবার কথাও ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৫-এর ডিসেম্বরে তিনি প্রুশিয়ার নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে এঙ্গেল্‌সকে সঙ্গে নিয়ে একবার মাস খানেকের জন্য ইংল্যাণ্ড ঘুরে এসেছেন। সেখানে শ্রমিক জীবন প্রত্যক্ষ করার কিছুটা সুযোগ পাওয়া গেছে। আর ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি। শিল্পবিপ্লব তো সে দেশেই প্রথম। পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ, শিল্পশ্রমিকের বিকাশ,

এসব জানবার জন্য তো ইংল্যাণ্ড আদর্শ জায়গা। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ সুযোগটা ভালোভাবেই নিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার-এর বিখ্যাত চেথাম গ্রন্থাগারে তাঁরা বিস্তর লেখাপড়া করলেন। অর্থনীতি ও ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র নিয়ে এই সময়ে তাঁরা অনেক চর্চা করেন।

আর এই অল্প দিনের মধ্যেই বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক নেতার সঙ্গে ওঁরা যোগাযোগ স্থাপন করলেন। *লীগ দ্য য়ুস্ত*-এর অনেক নেতার সঙ্গেও ওঁদের সম্পর্ক তৈরি হলো।

একটা কোনো সংগঠিত পার্টির আদল ওঁদের মনে এখন ফুটে উঠছে। ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা বিষয়ে ওঁদের চিন্তা এখন অনেক পরিষ্কার। পার্টির দরকার এখন ওঁরা বুঝছেন। এই পার্টির নেতৃত্বেই শ্রমিকরা একজোট হবে। পার্টি হবে শ্রমিকদের নিজেদের সংগঠন। আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগের মাধ্যম। বিচ্ছিন্ন শ্রমিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবার পথে এই সংগঠন হবে প্রধান অবলম্বন।

এই চিন্তার নানা জটিলতার দিকে ওঁদের নজর তখন খুব যায়নি। পার্টির বজ্র আঁটুনিতে স্বেচ্ছাচারের বিপদ থাকতে পারে। তেমন করে ক্ষমতায় আসা ও টিঁকে থাকা পার্টির অভিজ্ঞতা তো ওঁদের হয়নি। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্-এর কাছে পার্টি ছিল অন্য শ্রেণীর থেকে সামাজিক ক্ষমতা দখলের দিকে একটু করে এগিয়ে যাবার একটা বড়ো উপায়।

প্রথম ধাপ হিসেবে তৈরি হলো *ব্রুসেল্‌স্ কমিউনিস্ট সংযোগ সমিতি*। এই সমিতি একটা সেতু তৈরির চেষ্টা। বিভিন্ন দেশের কাছাকাছি চিন্তার মানুষের মধ্যে যোগাযোগ। এ রকম চিন্তার পরিচয় আমরা আগেও পেয়েছি। কিন্তু এবার শুধুমাত্র সাময়িক পত্র নয়, রীতিমতো এক সংগঠন।

লীগ্‌ দ্য য়ুস্ত নামের সাম্য সমিতি তো আগে থেকেই ছিল। ১৮৪৭-এর ২ জুন লণ্ডনে এই লীগের এক সম্মেলন উদ্বোধন হয়।

এটিই প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট লীগের প্রথম সম্মেলন। এঙ্গেল্‌স্ প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মার্ক্স টাকার অভাবে হাজির হতে পারেননি। 'সব মানুষই ভাই ভাই', এটা ছিল এই লীগের শিরোবাক্য। এখন থেকে গৃহীত হলো নতুন শিরোবাক্য, 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও'। এটিই এখনো পর্যন্ত আমাদের চেনা। মার্ক্সের বইয়ের মাথায় লেখা থাকে। এটা আসলে কমিউনিস্ট লীগের স্লোগান।

১৬

১৮৪৮। মার্ক্স ও এঙ্গেল্স্-এর যৌথ রচনা *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* প্রকাশিত হল। ছোটো একটি পুস্তিকা। কিন্তু সমাজ-অর্থনীতির আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরে এই বই ঘিরে অনেক আলোড়ন উঠবে। পৃথিবীর দেশে দেশে কমিউনিস্টরা তাদের ভাবধারা গড়ে তুলবে। বইটাকে নিয়ে এত কথা হয়েছে, আজও হচ্ছে। এতভাবে এত লোককে নাড়া দিয়েছে। প্রায় দেড়শো বছর বাদেও বইটা রীতিমতো জ্যান্ত রয়ে গেছে।

১৮৪৮-৪৯ এই সময়টা ইওরোপের দেশে দেশে বৈপ্লবিক উত্থানের সময়। শুরু হয়েছিল সুইৎসারল্যাণ্ড থেকে। তারপর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল নানা দেশে। ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, এমনকী জার্মানি। পোলাণ্ডে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন, প্রাহাতে চেক অভ্যুত্থান। শ্রমিকদের উত্থান। প্রজাতন্ত্র ঘোষণা।

পারীর শ্রমিকরা জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লুই ফিলিপের রাজত্বের অবসান ঘটাল। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত্রে পারী প্রজাতন্ত্রের খবর পৌঁছল ব্রুসেল্সে। মার্ক্স-এঙ্গেল্স্ দুজনেই তখন ওখানে। মাঝরাত্তির, রেলস্টেশন লোকে লোকারণ্য। রাত্রি সাড়ে বারোটায় ট্রেন ঢুকল। টাটকা বিপ্লবের খবরে সমবেত সবাই জয়ধ্বনি দিল, 'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক'। মুহূর্তে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে।

এর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বেলজিয়ামের কর্তৃপক্ষ মার্ক্সের বহিষ্কার-আদেশ ঘোষণা করলেন। ৩ মার্চ, ১৮৪৮। পরদিনই ভোরবেলায় মার্ক্সকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্ত্রী জেনিকেও। জিজ্ঞাসাবাদ করে দুজনকেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ।

তবে মার্ক্সকেও কিন্তু বেলজিয়াম ছাড়তে হলো। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী

সরকার অবশ্য দুহাতে মার্ক্সকে স্বাগত জানাল। 'স্বৈরাচার তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু মুক্ত ফরাসি দেশ আর একবার তোমার জন্য তার দরজা খুলে দিল', ফরাসি সরকারের এক সদস্য মার্ক্সকে এই আমন্ত্রণ জানালেন।

থিতু হয়ে তো বসে থাকার কথা নয়। মার্ক্স জার্মানিতে চলে এলেন। সঙ্গে এঙ্গেলস্। সরাসরি বিপ্লবে অংশ নিতে হবে। রাইন প্রদেশের কোলন অঞ্চলকে বেছে নিলেন নিজেদের কাজকর্মের জন্য। মার্ক্সের কাছে বিপ্লব তো শুধু মাঠে নয়, মাথাতেও। তাই এখানে এসেই আবার কাগজ বের করতে হলো।

সেই কবেকার *রাইনিশে ৎসাইটুং* পত্রিকা। সে কথা মাথায় রেখে এবার পত্রিকার নাম দেওয়া হলো *নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুং*। নয়া রাইন সংবাদ। মার্ক্স প্রধান সম্পাদক, এঙ্গেল্স্ প্রধান সহায়ক, প্রয়োজনে প্রায় সম্পাদক। প্রথম সংখ্যা বেরোল ১৮৪৮-এর ১ জুন। চলেনি বেশি দিন। ১৮৪৯-এর ১৯ মে বেরোল শেষ সংখ্যা। গোটা পত্রিকা লাল কালিতে ছাপা। লাল নিশান।

১৮৪৮-এর ইওরোপে যেখানেই বিপ্লব সেখানেই এই নয়া পত্রিকার সমর্থন। আবার প্রুশিয়ার কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু। একে বিপ্লব নানা জায়গায় ক্রমে ক্রমে পরাস্ত। বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে। আবার আঘাত নেমে এল। মার্ক্সকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রুশিয়া ছেড়ে যাবার আদেশ দেওয়া হলো। পত্রিকার সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তার কিংবা বহিষ্কার। কোলনের শ্রমিকদের জন্য মার্ক্স-এঙ্গেলসের শেষ কথা : 'শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি!'

১৮৪৯-এর হেমন্তে বিপ্লবের অবসান। কোথাও বিপ্লবীরা জেলে, কোথাও তারা দেশছাড়া।

মার্ক্স-এঙ্গেলস এলেন লণ্ডনে। মার্ক্সের বাকি চৌত্রিশ বছরের জীবনে এখানেই হবে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা।

নয়া রাইন সংবাদ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবী পত্রিকা তো চাই। বিপ্লবের ঐ দুর্দিনেও মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌ আবার বের করলেন এক নতুন পত্রিকা। *নয়া রাইন সংবাদ : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ*। আগের ধারাটাই যেন বয়ে চলেছে। এবার একটু জোর রাজনীতি ও অর্থনীতির সমালোচনার ওপর।

১৭

দুজনেই ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু তাও বিদায় আসন্ন হলো। এঙ্গেল্‌স্‌কে ম্যাঞ্চেস্টারে চলে যেতে হবে। মার্ক্স রয়ে গেলেন লণ্ডনেই। যদিও দুই বন্ধুর মধ্যে যোগাযোগ রইলই। আর লাভের মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম অজস্র মূল্যবান চিঠিপত্র।

দূরে গেলে তো চিঠি লিখতেই হয়। আর মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌-এর মতো ওরকম টগবগে দুজন লোক। লিখবেনই তো। নিজেদের নতুন ভাবনাচিন্তা নিয়ে, আবার বিপ্লবের সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে কত যে কথাবার্তা রয়েছে দুজনের চিঠিপত্রের মধ্যে।

আরো মজার ব্যাপার আছে। আসলে এতই মগ্ন ছিলেন ভাবনার জগতে যে সব সময়েই যেন আলোচনা বা তর্ক চলছে। মার্ক্সের ছোটো মেয়ে এলিয়ানোর-এর বর্ণনায় পাই যে, এঙ্গেল্‌স্‌-এর চিঠি এলে মার্ক্স নাকি চিঠির সঙ্গেই কথা বলতেন। যেন এঙ্গেলস্‌ কাছেই রয়েছেন।

'না, না, এরকম হতে পারে না।'

'তা এটা অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ।'

এসব ধরণের কথাবার্তা নাকি এক তরফাই চলত। মার্ক্স একা একাই চালিয়ে যেতেন।

মার্ক্সের এই ছোটো মেয়ে বেজায় ভক্ত ছিল এঙ্গেল্‌স্‌-এর। এঙ্গেল্‌স্‌ লণ্ডনে এলে মার্ক্সের বাড়িতে যেন উৎসব লেগে যেত। আর মেয়েদের নিয়ে এঙ্গেল্‌স্‌-এর বাড়িতে যখন বেড়াতে যেতেন মার্ক্স, তখন তো কথাই নেই।

এঙ্গেল্‌স্‌-এর আসবার কথা থাকলে মার্ক্স কয়েকদিন ধরে রীতিমতো অস্থির হয়ে থাকতেন। মুখে যেন ও ছাড়া আর কোনো কথা নেই। আর আসবার দিন সকালে তো খালি এ ঘর ও ঘর করতেন। এসে গেলে সারারাত ধরে গল্প তর্ক আলোচনা ধূমপান

কথা যেন আর ফুরোয় না। আগের বার দেখা হবার পরে যা কিছু ঘটেছে তার সব শোনা চাই। শোনা নয় তো শুধু, বিচার-বিশ্লেষণ ও আবার তত্ত্বের কথা, এ সবই।

মেয়েদের মুখে এঙ্গেলস্-এর নাম 'আঙ্কল এঞ্জেল্স্'। মেয়েদের কাছে যথার্থ দেবদূতই ছিলেন। সারাদিন বাচ্চাদের নিয়ে খেলা করা, রূপকথার গল্প শোনানো। সঙ্গে ছিল হাসির গান গাওয়া, আবার মেয়েদের শেখাতেনও সেসব গান।

মার্ক্সের মেয়েদের একটা মজার খেলা ছিল। স্বীকারোক্তির খেলা। ইংল্যাণ্ডে উনিশ শতকের মাঝামাঝি খুব জনপ্রিয় ছিল এ খেলা। প্রশ্ন আর উত্তর। তার মধ্যে ধরা থাকে কার কী ঝোঁক, কী পছন্দ এইসব। বড়ো মেয়ে জেনির একখানা অ্যালবাম পাওয়া যায়, তাতে মার্ক্স ও বাড়ির অন্যদের ও ঐ সময়ে মার্ক্সের ঘনিষ্ঠ অনেক নেতার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। মার্ক্সের কয়েকটি প্রশ্নোত্তর :

প্রিয় সদ্‌গুণ	...	সরলতা
পুরুষের প্রধান গুণ	...	সবলতা
মেয়েদের প্রধান গুণ	...	দুর্বলতা
নিজের প্রধান বৈশিষ্ট্য	...	উদ্দেশ্যের একমুখিতা
[ুখের ধারণা	...	লড়াই
ঃখের ধারণা	...	নতজানু হওয়া
য দোষ ক্ষমা করা যায়	...	সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা
সবচেয়ে ঘৃণ্য চরিত্রলক্ষণ	...	দাসত্ব
প্রিয় কাজ	...	বইয়ের পোকাগিরি
প্রিয় কবি	...	দান্তে, অয়সখুলস, শেক্‌স্‌পিয়ার, গ্যয়টে
প্রিয় গদ্যলেখক	...	দিদেরো, লেসিং, হেগেল. বালজাক্

প্রিয় নায়ক	...	স্পার্টাকুস, কেপ্‌লার
প্রিয় ফুল	...	ড্যাফ্‌নি
প্রিয় রং	...	লাল
চোখ ও চুলের প্রিয় রং	...	কালো
প্রিয় নাম	...	জেনি, লরা
প্রিয় খাবার	...	মাছ
প্রিয় সদুক্তি	...	*Nihil humani a me alienum puto* (মানবিক কোনো কিছুই আমার থেকে দূরে নয়।)
প্রিয় শিরোবাক্য	...	*De omnibus dubitandum* (সব কিছুতেই সন্দেহ থাকা উচিত।)

ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে একটা কাজই মার্ক্স ঠেসে করেছিলেন। পড়াশোনা। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পড়বার ঘরে। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একটা বিশেষ চেয়ার-টেবিল ছিল মার্ক্সের পছন্দ। ঐ চেয়ারে ঐ টেবিলে বসে রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও মানুষের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পড়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন লোকের লেখা পড়ছেন। নোট করছেন, বড়ো বড়ো অংশ টুকে রাখছেন। নিজের মতো ভাবছেন। যা পড়ছেন সেগুলোকে সমালোচনা করছেন। নিজস্ব রচনাও লিখে চলেছেন। খশড়ার পর খশড়া তৈরি হচ্ছে। পাতার পর পাতা লেখা জমে উঠছে।

যতকিছু লিখেছেন এই সময়ে, তার অতি সামান্য অংশ প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তখন। আসলে অনেক লেখার চূড়ান্ত চেহারা তৈরি হবার আগেই বদলে ফেলছেন। প্রকাশ করাটাই ঠিক প্রধান লক্ষ্য ছিল না। ঐ যে অনেক দিন আগে একবার বলেছিলেন, নিজের কাছে চিন্তা

পরিষ্কার করার কথা। সেটা খুব বড়ো জিনিস ছিল। যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ থামা যাচ্ছে না। তা ছাড়া রাজনীতিতে ব্যস্ত ছিলেন। প্রকাশের সেও এক অন্তরায়।

১৮৫৯-এ একটা বই বেরোল। *ৎসুর ক্রিটিক ডের পলিটিশ্চেন অয়কোনমি*। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা। এর জন্যই তো এতদিনের প্রস্তুতি। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির যাবতীয় লেখকের লেখা পড়ে নিয়ে তবে তৈরি হলো তাঁর নিজের সমালোচনা। পুঁজির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ। আগের লেখকদের বিশ্লেষণ মনে হলো অগভীর। মানুষের সমাজে উৎপাদনের ভূমিকা তাঁরা তেমন করে তলিয়ে ভাবেননি। আরো ভেতরে যেতে হবে।

এই পথেই এগিয়ে একদিন পৌঁছে যাবেন *ডাস কাপিটাল* গ্রন্থে। পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন, বিনিময়, বিকাশ ইত্যাদির নিপুণ বিশ্লেষণে ভরা এক বই। মার্ক্সের সবচেয়ে বিখ্যাত বই। বইটা নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্কও আছে। অনেকেই মনে করেন এ বইয়ের মূল কথা সবই ভুলে ভরা। অনেকেই আবার এ অভিযোগের জোরালো জবাব দেবারও চেষ্টা করেছেন। তোমরা বড়ো হয়ে নিজেদের মতো এ সব কথার বিচার করার চেষ্টা করবে। মার্ক্সের সারা জীবনের পরিশ্রমের ফসল এই বই। নিজেদেরও পরিশ্রমেই তো তাকে বুঝে নিতে হবে।

লেখাপড়ার সঙ্গে ছিল সংগঠনের কাজ। লণ্ডনে থাকতে মার্ক্স আবার আস্তে আস্তে ইনটারন্যাশনাল-এর কাজে জড়িয়ে পড়লেন। শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চেহারা তো বরাবরই কল্পনায় ছিল। তার তত্ত্বও ছিল যথেষ্ট মজবুত। *দি ইনটারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন* নামে যে-সংগঠন তৈরি হলো সেটাই প্রথম আন্তর্জাতিক নামে বেশি পরিচিত।

১৮৫২-তে কমিউনিস্ট লীগ ভেঙে যাবার পর থেকে মার্ক্স ঠিক পার্টি-ঘেঁসা রাজনীতির মধ্যে খুব বেশি ছিলেন না। নিজের লেখাপড়া

নিয়েই থাকতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার আন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম খুঁটিয়ে লক্ষ করতেন। নিজেকে সরাসরি খুব কিছুতে জড়াচ্ছিলেন না। সভাসমিতি সাধারণত এড়িয়ে চলতেন।

১৮৬৪-র ২৮ সেপ্টেম্বর সেন্ট মার্টিন হলে সভা হবে। সেই সভা থেকেই প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হবে। এই সভার নিমন্ত্রণ মার্ক্স প্রত্যাখ্যান করলেন না। যদিও আমন্ত্রণ তাঁর কাছে পৌঁছেছিল খুবই দেরিতে, প্রায় শেষ মুহূর্তে। লণ্ডন ও পারীর প্রতিনিধিরা এই সভায় একযোগে উপস্থিত থাকবেন। মার্ক্স রাজি হয়ে গেলেন।

সভাতে তিনি প্রায় চুপচাপই ছিলেন। যদিও এই আন্তর্জাতিকের যে সাধারণ পরিষদ্ গঠিত হয় মার্ক্সকে প্রথম থেকেই তার সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এই আন্তর্জাতিকের কাজকে কেন্দ্র করে তিনি আবার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন কিছুদিনের জন্য।

১৮৭১-এ এল পারী কমিউন। ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করল। বেশি দিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। মাস দুয়েক মাত্র। এই উত্থানের অনেক দ্বিধাদুর্বলতা তো ছিলই। তবুও এত বড়ো একটা ঘটনা। মার্ক্স গভীর তত্ত্বদৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করছেন এসব। লিখছেনও। রাষ্ট্রবিপ্লব, মুক্তি আন্দোলন, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এসব ব্যাপারে উৎসুক থেকেছেন বরাবর।

১৮

লণ্ডন, ১৮৭২। গোটা মার্ক্স-পরিবার এখন লণ্ডনে। জেনি ও লরা। জেনির স্বামী শার্ল লঙ্গে। ফরাসি সমাজতান্ত্রিক, পারী কমিউনের সদস্য। লরার স্বামী পল লাফর্গও ফরাসি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন। পারী কমিউনের পতনের পরে স্পেনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সপরিবার দুই বোনই এখন লণ্ডনে। কাছাকাছি ফ্ল্যাট।

এখন এঙ্গেল্‌স্‌ও মার্ক্সের বাড়ির খুব কাছে থাকেন। সেই যে ম্যাঞ্চেস্টারে যাবার সময়ে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। এখন দুই বন্ধুর প্রায় রোজই দেখাশোনা হয়। দুপুর একটা নাগাদ এঙ্গেল্‌স্‌ চলে আসেন মার্ক্সের কাছে। মেয়েদের সঙ্গেও তো এঙ্গেল্‌স্‌-এর খুব ভাব। সবাই মিলে বেশ জমজমাট।

আর ছোটো মেয়ে এলিয়ানোর তো একাই একশো। মার্ক্সের বাড়িতে বসত এক পারিবারিক শেক্‌স্‌পিয়ার ক্লাব। এলিয়ানোর ছিল তার প্রাণকেন্দ্র। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌ নিজেরাও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক থেকে পাঠ হতো, অংশবিশেষ অভিনয় হতো। আর দল বেঁধে লাইসিয়াম থিয়েটারে নাটক দেখতে যাওয়া হতো। দাপটের সব অভিনয়। *হ্যামলেট, মার্চেন্ট অব্‌ ভেনিস, কিং লিয়ার,* আরো কত।

কিন্তু সবটাই এ রকম শুধু হাসিখুশি ছিল না, থাকেও না। মাঝে মাঝেই আর্থিক সংকট সব কিছুর ওপর চেপে বসত। পারের কাণ্ডারি ছিলেন এঙ্গেল্‌স্‌। এত অন্তরঙ্গ বন্ধু, এত অকাতর সাহায্য। কিন্তু তাও যে কখনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি তা নয়। একটু আধটু মনান্তর, তাও। সম্পর্ক চিড় খায়নি। সামলে নিয়েছেন। অনেক সময়ে এঙ্গেলস্‌কে হয়তো অভিমান চেপে রেখেই এগিয়ে আসতে হয়েছে।

শেষ বছর দশেক নানা ব্যক্তিগত অসুবিধার মধ্যেও লেখাপড়ার

কাজে একেবারে ডুবে ছিলেন মার্ক্স। শুধু বাঁধা খাতে পড়াশোনা নয়। চিন্তাভাবনার নতুন ধরণ গড়ে উঠছে। *ডাস কাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ড সেই কবে বেরিয়েছিল। গোটা বইটা তো শেষ হয়নি এখনো। পুঁজির বৃত্তান্ত তো সবটুকু বলাই হয়নি এখনো।

নোটের পর নোট চলছে, খশড়ার পর খশড়া। আর চলছে পুঁজিবাদের নতুন নতুন ধরণধারণ নিয়ে তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। এই সময়টাতে বিশেষ করে নজর গেল রাশিয়ার দিকে আর আমেরিকার দিকে। রুশ ভাষা সূত্রে রাশিয়ার সমাজ সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে বুঝতে চাইলেন।

সমাজ রূপান্তর বিষয়ে অন্য সব কথা মাথায় আসছে। ইংল্যাণ্ড তো শিল্প উৎপাদনে অনেক এগিয়ে থাকা দেশ। পুঁজিবাদের বিকাশ সব দেশে ঐ এক রকম ধাঁচেই হবে কেন? বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস আলাদা, তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও তো এক নয়। তাহলে সব সমাজ ইংল্যাণ্ডের পথে তো নাও এগোতে পারে। এসব ব্যাপারে সজাগ হচ্ছেন।

এ ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ কাজ নয়। চিন্তাভাবনার একটা ধরণ তো এত দিনে মাথার মধ্যে বসে গেছে। ঝোঁক থাকে সেই আদলেই সব কিছু মিলিয়ে নেবার। অন্য চিন্তায় সাড়া দেওয়া খুব কঠিন কাজ। নিজের ভাবনাকে ভাঙতে হয়। মার্ক্স নিজেকে ভাঙছিলেন।

বয়স বেড়েছে, শরীর ভেঙেছে। বাইরের বাধাবিপত্তি চেপে ধরছে। কিন্তু চিন্তার তাজা ভাবটা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। নতুন নতুন দিকে মন সরছে। শেষ বেলাকার মার্ক্সের চিন্তাভাবনার দিকে আমাদের আরো মনোযোগ দেওয়া উচিত। এক নতুন রকমের মার্ক্সকে হয়তো পেয়ে যাব সেখানে। আর সে তো আমাদেরই লাভ।

১৯

মৃত্যু।

মার্ক্স নিজে ও স্ত্রী জেনি কয়েক বছর ধরেই ভুগছিলেন। স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে হয়েছে কয়েকবার।

১৮৮১-র ২ ডিসেম্বর জেনির মৃত্যু হলো।

বছরখানেক যেতে না যেতে মারা গেল বড়ো মেয়ে জেনি। ১৮৮৩-র ১১ জানুয়ারি। রেখে গেল তার পাঁচটি সন্তান।

পর পর এই দুই ধাক্কা মার্ক্স আর ঠিক সামলে উঠতে পারেননি। মার্ক্সের দুই মেয়ে ও এঙ্গেল্‌স্ এই সময়ে ওঁর স্বাস্থ্য নিয়ে খুবই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতেন।

আর দুশ্চিন্তায় থাকতেন হেলেন ডেমুথ। এই মহিলা বলতে গেলে সারাটা জীবন মার্ক্স-পরিবারকে আগলেছেন। জেনির মায়ের বাড়ি থেকে ইনি এসেছিলেন জেনির নতুন সংসারে। সেই কবে। আর সেই থেকে বিপ্লবী এই পরিবারটির সুখ দুঃখ আনন্দ ও কষ্ট সব তিনি ভাগ করে নিয়েছেন চিরকাল।

১৮৮৩-র ১৪ মার্চ।

> 'দুপুর ঠিক ২–৪৫-এ, মাত্র দু-মিনিটের জন্য তাঁকে একলা রেখে গেছি আমরা। ফিরে এসে দেখি শান্তভাবে ঘুমোনো, আর কখনো জাগবার নয়। আমাদের পার্টির সবচেয়ে শক্তিশালী মাথার চিন্তা থেমে গেছে। আমার জানা সবচেয়ে সবল হৃৎপিণ্ডটি স্তব্ধ।' পরের দিন এঙ্গেল্‌স্ লিখছেন বন্ধুদের জন্য।

লণ্ডনের হাইগেট কবরখানায় ১৭ মার্চ তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এঙ্গেল্‌স্-এর অন্তিম ভাষণের শেষ কয়েকটি কথা :

> 'যুগে যুগে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে, আর তাঁর কাজও।'

২০

এমন একটা জীবন। মৃত্যুই তো আর শেষ কথা হতে পারে না। তাই নতুন পরিচ্ছেদ যোগ করতে হয়।

মৃত্যুর পরে চিন্তায় প্রভাবে প্রেরণায় আদর্শে তো বেঁচে থাকা যায়। মার্ক্সও আজ একশো বছরের ওপর তেমনি বেঁচে আছেন। তর্কেবিতর্কে নিন্দাপ্রশংসায় সমালোচনায় ব্যাখ্যানে ও টীকাটিপ্পনীতে মার্ক্স এখনো সমান সতেজ।

কিন্তু মার্ক্সের ক্ষেত্রে মৃত্যুর আগেও যে মৃত্যু ছিল। একবার নয়, বারবার। ঐ যে এঙ্গেল্‌স্‌ বন্ধুদের জন্য চিঠি লিখলেন মৃত্যুর ঠিক পরের দিন, তার কারণ ছিল। এই চিঠিটা লিখেছিলেন মার্ক্স ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু যোহান ফিলিপ বেকার-কে। ইনি একজন জার্মান কমিউনিস্ট। ১৮৪৮-এর জার্মানির বিপ্লবে তিনি সঙ্গী ছিলেন। এ রকম চিঠি ও তারবার্তা এঙ্গেল্‌স্‌ বন্ধুদের অনেকের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এবার যে সত্যিই পালে বাঘ পড়েছে।

মার্ক্সের প্রকৃত মৃত্যুর অনেক আগে থেকে ইওরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হতো। ফলে বিশ্বাসযোগ্য কোনো সূত্র থেকে না জানলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বন্ধুদের পক্ষে মার্ক্সের মৃত্যুর কথা সত্যি বলে মেনে নেওয়া শক্ত।

মার্ক্স নিজেও তাঁর অনেক মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হতে দেখেছেন। একবারই শুধু নিজের মৃত্যুসংবাদ বিষয়ে নিজে চিঠি লিখেছিলেন।

নিউ ইয়র্কের *উড়হাল অ্যাণ্ড ক্ল্যাফিন্‌স্‌ উইক্‌লি* পত্রিকার ১৮৭১-এর ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় মার্ক্সের অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হয়। সঙ্গে ছিল এক দীর্ঘ শোকপ্রস্তাব। এই পত্রিকাই মার্কিন দেশে প্রথম *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* প্রকাশ করে।

শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয় নিউ ইয়র্কের *কাউন্সিল অব্ দ্য কসমোপলিটান কন্‌ফারেন্স*-এর এক পূর্ণ সভায়। ভিক্টোরিয়া উড্‌হাল ও তাঁর বোন টেনেসি ক্ল্যাফিন এই দুজনে মিলে চালাতেন পত্রিকাটি। তখনকার সময়ের প্রগতিশীল ধ্যানধারণার কাগজ। এঁরা কোনো দুরভিসন্ধি থেকে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেছিলেন তা নয়।

প্রকৃত মৃত্যুর বারো বছর আগের সেই শোকপ্রস্তাবে বলা হয়েছিল :

> 'মার্ক্সের অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর খবরে আমরা বিস্ময়াভিভূত ; এবং আমরা মনে করি যে কার্ল মার্ক্স ছিলেন সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী ও জনগণের পক্ষে একজন প্রকৃত নির্ভীক ও নিতান্ত স্বার্থলেশহীন সমর্থক।
>
> জনস্বার্থের এত শক্তিশালী একজন সমর্থকের শূন্যতায় আমরা নিদারুণ ব্যথিত। শুধু ইওরোপ নয়, সকল দেশের শোষিত শ্রমিকরাই আজ মার্ক্সের পরিবার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের এই শূন্যতার মুহূর্তে তাঁদের শোকের অংশীদার হতে চায়।
>
> নিউ ইয়র্কের *কসমোপলিটান কন্‌ফারেন্স* কার্ল মার্ক্সের পরিবার ও আন্তর্জাতিক মেহনতি মানুষের সংগঠনকে তাদের গভীর শোক জ্ঞাপন করছে।
>
> সাহসিকতা ও উদারতার সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে তিনি যে-সমস্ত অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, কার্ল মার্ক্সের মৃত্যুর পরে *কসমোপলিটান কন্‌ফারেন্স*-এর প্রতিটি সদস্য এবং শোষিত নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতিটি বন্ধুর উপর সেইসব উদ্দেশ্য সাধনে দ্বিগুণ পরিশ্রম করার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে।
>
> সংস্কার-সংগ্রামের এই সহযোদ্ধার মৃত্যুতে আমরা

ব্যক্তিগত শোক অনুভব করছি। এবং আমাদের অমেয় ক্ষতির কথা মনে রেখেও আমরা জানাতে চাই যে আমরা প্রকৃতপক্ষে নিরাশ নই। অনেক সংগ্রামেই জয়ের দিন যে আসন্ন, সে কথা তিনি আগাম অনুভব করে গেছেন। সেসব কাজে অংশ নেবার তাঁর আর অবকাশ ছিল না। আমরা নিঃসংশয়ে এবং দৃঢ় সাহসিকতার সঙ্গে সেই কাজের পূর্ণতাসাধনে উদ্‌বুদ্ধ হব।

এই শোকপ্রস্তাবের এক কপি মৃতের পরিবারে পাঠানোর জন্য সম্পাদককে নির্দেশ দেওয়া হোক।'

নিজের মৃত্যুসংবাদ বিষয়ে মার্ক্স তাঁর পত্রে জানাচ্ছেন: 'আমার মৃত্যুসংবাদটি বানানো হয়েছিল পারীতে, এর প্রণেতা বোনাপার্তপন্থী পত্রিকা *আসেনিক লিবেরাল*।'

বোনাপার্তপন্থার রকমসকম নিয়ে মার্ক্স তো কত কথাই লিখেছিলেন। সেই যে *অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার*, সেই বই তো এই বোনাপার্তপন্থারই বিশ্লেষণ।

অনেক পত্রিকাই মার্ক্সের মৃত্যুসংবাদ ও তাঁর শারীরিক অসুস্থতার নানা ভুল খবর প্রচার করত। বন্ধুর মৃত্যুর পরে তাই এঙ্গেল্‌স্-এর অন্যতম কাজই হলো অসুখ ও মৃত্যুর নির্ভুল খবর অন্য বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অনেক তারবার্তা পাঠিয়ে ও অনেক চিঠি লিখেও দেখা গেল ভুল ধারণা ঠিক ভাঙছে না। তাই ২৮ এপ্রিল তারিখে মার্ক্সের মৃত্যু নিয়ে এঙ্গেল্‌স্ নতুন করে একটা ছোটো লেখা লিখলেন। ৎসুরিখ্-এর *সোৎসিয়ালডেমোক্রাট* পত্রিকায় ৩ মে ছাপা হয় সে লেখা।

অসুখ ও চিকিৎসার বর্ণনা দেবার পরে শেষ দিনের কথায় লিখছেন এঙ্গেল্‌স্ : 'তারপর আমি ওঁকে দেখতে যাই একদিন—দুপুর ২টো থেকে ৩টে-র মধ্যে। গোটা বাড়িটাই যেন কাঁদছে। সবাই বলল : আজ খুবই দুর্বল, এবার বোধ হয় শেষ সময় এসে গেল। সেদিন

সকালেও দুধ, সুপ ও ওয়াইন কিছুটা খেয়েছেন, ভালোভাবেই। ...লেঞ্চেন ডেমুথ উপরতলায় গেলেন মার্ক্সের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে ডাকলেন, "এখুনি ওপরে এসো, কেমন যেন ঘুমোনো"। আমরা উপরের ঘরে ঢুকে দেখি, ঘুম, চিরতরে। আরাম কেদারায় ঘুমন্ত কার্ল মার্ক্স, এর চেয়ে আর শান্ত মৃত্যু কী হতে পারে...'